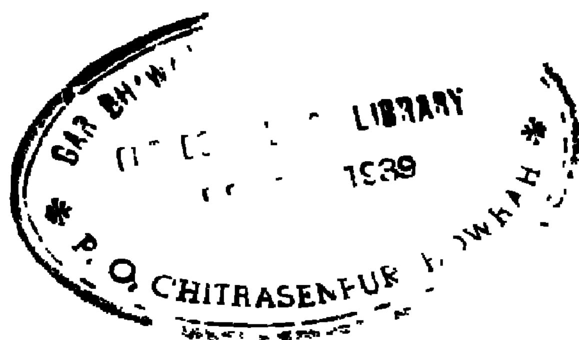


মুক্তি-স্নান

শ্রীপ্রভাবতী দেবী, সরস্বতী

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২১।১, ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা

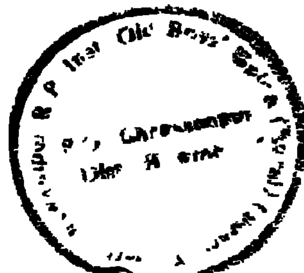
তৃতীয় সংস্করণ
১৩৪৯

এক টাকা

প্রিন্টার—শ্রীকালীপদ না
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়াব
৬, চালতাবাগান লেন, কলিকা

পুরাণো যে দিন গেছে
তাহারে স্মরিয়া আমি
দিনু এই ক্ষুদ্র উপহার,
মোর শ্রেষ্ঠ পূজা উপচার।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী, সরস্বতী



মুক্তি-স্নান

১

প্রভাতের আলো ধরার বুকে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সৈকতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

ধড়ফড় করিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

ঘরের দরজা তখনও ভিতর হইতে বন্ধ, সেই দিকে তাকাইয়াই গত রাত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল।

ব্রজেশ্বর পূব্‌পাড়া হইতে ফিরিয়াছিল রাত্রি প্রায় বারোটার সময়। সে সখের থিয়েটারে পার্ট নেয়, মেয়েদের মত হাব-ভাব কথাবার্তা চাল-চলন—এ সবই তাহার মজ্জাগত, সেইজন্য সে থিয়েটারে মেয়ে সাজে, এবং তাহাকে না হইলে নাকি থিয়েটারই হয় না।

আজ কয়দিন সে কাজে যায় নাই। ঘরে এদিকে হাঁড়ি শিকায় উঠিবার হইয়াছে। সৈকত দু'দিন বলিয়াছে, ব্রজেশ্বরের বিধবা ভগিনী দিন-[illegible]চট বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ব্রজেশ্বরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপই ছিল না। '[illegible]গুপ্তে'র মধ্যে সে 'ছায়া'র পার্ট লইয়াছে, এই আনন্দেই সে মস্‌গুল, [illegible]াকে আর-পায় কে?

মুক্তি-স্নান

এতবার এত থিয়েটার হইয়াছে, এরকম পার্ট ব্রজেশ্বর কখনও পায় নাই, ছোট-খাট ভূমিকাতেই সে অবতীর্ণ হইয়াছে। এবারে ছোটবাবু স্বয়ং তাহাকে ডাকিয়া 'ছায়া'র পার্ট দিয়াছেন, এ আনন্দ তাহার রাখিবার স্থান ছিল না, পথে-ঘাটে প্রতিদিন সে যাহাকে সম্মুখে দেখিয়াছিল, তাহাকেই সগর্ব্বে শুনাইয়া দিতেছিল—ছোটবাবু স্বয়ং তাহাকে ডাকিয় 'ছায়া'র পার্ট দিয়াছেন।

বাড়ীতেও সে-দিন একশত বার একথা সকলকে শুনাইতেছিল।

স্ত্রী সৈকত সহরের মেয়ে, অনেক থিয়েটার সে দেখিয়াছে, এ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানও নাকি খুব। সেবার যখন ছোটবাবুর বাড়ীতে "প্রফুল্ল" প্লে হইয়াছিল, তাহাতে ব্রজেশ্বর 'জননী' সাজিয়াছিল।

বাড়ীতে ফিরিয়া স্ত্রীকে যখন সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "থিয়েটার কেমন দেখলে,—আমার পার্টটা কি রকম হয়েছিল?"

তখন সৈকত উত্তর দিয়াছিল, "ছাই হয়েছে, এই বুঝি—ভালো? পাড়াগাঁয়ের লোকগুলো তো কিছু দেখতে পায় না, তাই যা কিছু দেখে, হাঁ করে গেলে, সব যেন জড়ভরত। তুমি তো মোটে নড়তেই পারছিলে না, কথাও সব বেধে যাচ্ছিল।"

ব্রজেশ্বর সত্যই রাগিয়াছিল, দুই চোখে আগুন ঢালিয়া সে স্ত্রীর পানে তাকাইয়াছিল। যদি সত্যযুগ হইত, সৈকত নিশ্চয়ই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত, কিন্তু এ নাকি কলিযুগ, তাই সে-দৃষ্টিতে কিছুই হয় নাই।

ইহার পর হইতে ব্রজেশ্বর স্ত্রীকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

ইহাতে সৈকতের আপত্তি করিবার কিছুই ছিল না—যদি সে সংসারের পানে তাকাইত। সংসারে কিছুই নাই—অথচ তিন তিনটী বালক-বালি

মুক্তি-স্নান

ব্রজেশ্বর একটা দোকানে কাজ করিত, আজ দশ-বারো দিন সে দোকানের ছায়াও মাড়ায় নাই, দিনরাত পুব্‌পাড়ায় কাটাইয়া দেয়।

দিদিও দিনরাত বকিতেছেন—ব্রজেশ্বরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপই ছিল না।

পুরুষত্ব হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু কাল রাত্রে।

রাত্রি বারোটার সময় বাড়ী ফিরিয়া সে যখন বন্ধ দরজায় আঘাত করিল, তখন সৈকতই দরজা খুলিয়া দিয়াছিল।

মনটা ভারি স্ফূর্তিযুক্ত ছিল, আহারে বসিয়া সে গুণ্‌ গুণ্‌ করিয়া গাহিতেছিল—

আয়রে বসন্ত ও তোর
কিরণ-মাখা পাখা তুলে।

সৈকত অনেকক্ষণ সহ্য করিয়াছিল। যখন দেখিল ব্রজেশ্বরের আহারের দিকে মোটেই আকর্ষণ নাই, গান লইয়াই তন্ময় হইয়া রহিল, তখন সে অকস্মাৎ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—"থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। রাত বারোটার পর তো বাড়ী এসেছ, ভাত খেতে বসে আবার এক ঘণ্টা লাগল; আর যে চীৎকার • দিদি সারাদিন একাদশীর উপোস করে শুয়ে পড়েছেন, ওঁর পর্য্যন্ত ঘুম ভেঙ্গে যাবে। খেয়ে নিয়ে আড্ডায় যাও, সারারাত ধরে চীৎকার কর গিয়ে, কেউ কিছু বলবে না।"

ব্রজেশ্বর হঠাৎ থামিয়া গেল, দৃপ্তচোখে স্ত্রীর পানে তাকাইয়া বলিল, "আশ্চর্য্য!···বাড়ীতে এলেই তোমাদের মাথায় যেন বাজ পড়ে, কেবল ঝগড়া আর ঝগড়া। তবে কি বলতে চাও, আমি দিনরাতই বাইরে থাকব, বাড়ীতে মোটে আসব না?"

সৈকত বলিল, "সে কথা কেউ কোনদিন বলে নি, বলবেও না। কিন্তু

মুক্তি-স্নান

তুমি এ করছো কি বল দেখি ?—দোকানের কাজে আজ দশ-বারো দিন যাও নি, দত্ত মশাই দু'দিন খবর দিয়ে আজ হ'তে নতুন লোক রেখেছেন। সংসার কি করে চলবে বল দেখি ? এই যে রাতটা গেলে কাল দ্বাদশী, সকালে ঐ বুড়ো মানুষটাকে জল খেতে দেব কি ?"

ব্রজেশ্বর আবার গুণ্ গুণ্ করিতেছিল, গানের সুর থামাইয়া বলিল, "ঘরে কিছু নেই ?"

বড় রাগ করিয়াই সৈকত বলিল, "হ্যাঁ, আছে বই কি ! তুমি যে এনে দিয়েছ।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "দেখ, আমি আর এ সব সইতে পারছি নে, তার চেয়ে বল—আমি পিসীমার কাছে চলে যাই। বাপ-মা নাই বা রইল, পিসী তো আছে।"

ব্রজেশ্বর রাগ করিয়া বলিল, "যাও না, কে তোমায় বারণ করছে ? কালই তোমার পিসীকে পত্র দাও, দিয়ে চলে যাও।"

সৈকত ক্ষণকাল পলকহীন নেত্রে ব্রজেশ্বরের পানে তাকাইয়া রহিল।

একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবু থিয়েটার ছাড়তে পারবে না ? ওতেই যে গোল্লায় গেলে। শরীর গেল—কাজও গেল। আর কি থিয়েটারই যে করবে, সে আমি বেশ জানছি। সেই সঙের মত দাঁড়িয়ে, পঞ্চাশবার ঘেমে, ঘেমে নেয়ে উঠে—"

নাঃ, ব্রজেশ্বর আর সহিতে পারে না।

সে আসনের উপরেই উঠিয়া দাঁড়াইল। বিকৃতমুখে বলিল, "তুমি খেয়োও ব'লছি, যাও, দিদির কাছে শোও গিয়ে।"

মুক্তি-স্নান

সৈকত দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ, এই রাত্রে আমি দিদিকে গিয়ে আবার ডাকি। আমি এই ঘরেই থাকব, ও-ঘরে যাব না !"

"না, যাবে না বই কি, যেতেই হবে।"

ব্রজেশ্বর সৈকতের হাত ধরিয়া টানিল,—"যাও, আমায় নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে দাও, তুমি এ-ঘরে থাকলে আমার ঘুম হবে না।"

(ইচ্ছা করিলে সৈকত একটানেই হাত সরাইয়া লইতে পারিত, কিন্তু সে তাহা কবিল না। (কেবল মাত্র বলিল, "বেশ, আমি বার হ'য়ে যাচ্ছি, তুমি ঘুমোও।")

সে বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইল। ব্রজেশ্বর হাত-মুখ ধুইয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

এ রকম আজ নূতন নয়, প্রায়ই সৈকত বৃদ্ধা ননদের নিকট গিয়া রাত্রে শয়ন করে।

আজ তাহার সে ইচ্ছা রহিল না, প্রত্যহই একই ঘটনার পুনরাবর্ত্তন করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বারাণ্ডার দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া সে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

চৈত্রের শেষ হইয়া আসিয়াছে,—গরমও বেশ পড়িয়াছে। বাহিরে অজস্র চাঁদের আলো—সমস্ত উঠানটায়, দূরে গাছ-লতাপাতার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঘরের পাশে বৈশাখী-চাঁপার গাছটীতে ফুল ফুটিয়াছিল, চৈতি হাওয়া সেই গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল। দূরে কোথায় একটা পাপিয়া ডাকিতেছিল,—'চোখ গেল', 'চোখ গেল',—বহুদূর হইতে আর একটা পাপিয়া তাহার উত্তর দিতেছিল।

মুক্তি-স্নান

বিবাহ হইয়াছে আজ পাঁচ বৎসর, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দিনগুলার কথাই মনে পড়ে, চোখে জল আসে।

সে-দিনের সহিত এ-দিন মিলাইয়া সৈকত স্তম্ভিত হইয়া যায়।

স্বপ্নের অগোচর ছিল যাহা, অদৃষ্টে তাহাই হইয়া গেল সত্য। যখন সে স্কুলে যাইত, তখন তাহারও আশা ছিল অপরিমিত,—সে-সব স্বপ্ন আজ কোথায়।

ভাবিতেও হাসি পায়।

আজ সে একটী দরিদ্র সংসারে গৃহিণী। আজকার দিন গেলে কাল কি খাইবে, তাহা ভাবিতে হয়। আশ্চর্য্য দুনিয়ার পরিবর্ত্তন, মানুষের ভাগ্যচক্র কিরূপ ভাবে যে ঘুরিয়া যায়..

পাখী ডাকিতে লাগিল, জ্যোৎস্না অবিরল ধারায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সৈকত কখন ঘুমাইয়া পড়িল।

সেই ঘুম ভাঙ্গিল একেবারে ভোর-বেলায়।

২

প্রতিদিনকার কাজ নিয়মমতই চলিতে থাকে, ব্যতিক্রম এতটুকু হয় না।

তবু আজ কাজ করিতে করিতে সৈকত বার বার অন্যমনস্ক হইতেছিল, বার বার কেবল সেই পুরাতন দিনের কথাই মনে পড়িতেছিল।...

বাড়ী ছিল কৃষ্ণনগরে, পিতা সেখানে কাজ করিতেন। মা কবে মারা গিয়াছেন, মনে পড়ে না। বড় ভাই আই-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল, এবং ইহাই লইয়া পিতার সহিত বিবাদ করিয়া সে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। শুনা যায়, সে বিবাহ করিয়াছে এক পাঞ্জাবী মেয়েকে এবং পাঞ্জাবেই রহিয়া গিয়াছে। ছোট ভাই অনেকদিন আগেই মারা গিয়াছে।

পিতা সামান্য ষাট্ টাকা বেতনে কাজ করিতেন, সমস্তই খরচ হইয়া যাইত, কন্যার যে একদিন বিবাহ দিতে হইবে—বিবাহে খরচ-পত্র করিতে হইবে সে কথা যেন তাঁহার মনেই ছিল না।

মনে পড়িল সেই দিন, যে-দিন তিনি শেষ-শয্যায় শয়ন করিলেন।

প্রথম সেই দিনই যেন তরুণী কন্যার পানে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, সেদিন তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

ভগিনী ভাইকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার হাত দু'খানা ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিয়াছিলেন, "মেয়েটা রইল বোন, ওকে দেখিস, ওর আর কেউ রইল না।"

মুক্তি-স্নান

অশ্রুপূর্ণনেত্রে ভগিনী ভ্রাতার দান গ্রহণ করিলেন, নিশ্চিন্তমনে ভ্রাতা চক্ষু মুদিলেন।

মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে লেখাপড়া ছাড়িয়া, কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া, চোখ মুছিতে-মুছিতে সৈকত পিসীমার সঙ্গে নবদ্বীপ যাত্রা করিল।

পিসীমার অবস্থাও বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না। মেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া তিনি তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

এই সময় ব্রজেশ্বরের দিদি নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, ব্রজেশ্বরও সঙ্গে ছিল।

ছেলেটী স্বজাতি, তাহার সুন্দর আকৃতি দেখিয়া পিসীমা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাহার বিদ্যা, সাংসারিক অবস্থা—কিছুই দেখিলেন না, একদিন তাহারই হাতে সৈকতকে দান করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

পুরুষ মানুষ, বেশী লেখাপড়া না হয় না-ই শিখিল, নিজের সংসার যেমন করিয়াই হোক প্রতিপালন করিবেই—এ-জ্ঞান পিসীমার ছিল। জোয়াল স্কন্ধে লইলে অনেক দুষ্ট গরুও সোজা হয়, মানুষই বা কেন হইবে না?

সে আজ পাঁচ বৎসর আগেকার কথা।

কিন্তু জোয়াল ঘাড়ে পড়িলেও ব্রজেশ্বর সোজা হইল না, থিয়েটারের নেশা তাহাকে ছাড়িল না, প্রবল উৎসাহে সে থিয়েটার চালাইতে লাগিল।

গ্রামের মধ্যে ধনী বোস মহাশয়। কিন্তু এখন তিনি গতায়ু, তাঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান। বড়বাবু অমরনাথ ঘোর সংসারী, পয়সার ঝাড়া আর

কিছুই বুঝেন না। ছোটবাবু রমেন্দ্রনাথ সংসারী হইলেও সংসারের মধ্যে পা দেন নাই। লোকটা বড় বিলাসী, থিয়েটারের নেশা তাঁহার অতি প্রবল, এবং ইহারই জন্য তিনি বৎসর-বৎসর অনেক টাকাই খরচ করেন।

গ্রামের রঘুনাথ এককালে এই ক্লাবেই থিয়েটার করিত। তাহার পর সে কলিকাতায় গিয়া থিয়েটারে ভর্ত্তি হইয়াছে, নামও বেশ করিয়াছে। সম্প্রতি ছোটবাবু তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মস্ত বড় সভা ডাকিয়া জোর বক্তৃতা দিয়া তাহার গলায় স্বহস্তে সোনার মেডেল ঝুলাইয়া দিয়াছেন, এবং নিজের হাতের সোনার ঘড়িটা তাহাকে পরাইয়া দিয়াছেন।

গ্রামের ছেলেরা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, প্রত্যেকেই পণ করিল, তাহারা রঘুনাথের মত যশস্বী হইবে, দেশের নাম উজ্জ্বল করিবে।

সৈকত এই দলটিকে মোটেই দেখিতে পারিত না। মানুষ হইবার আর কি কোনো উপায় নাই, অভিনেতা হইয়া নাম কিনিতে হইবে? ছিঃ ·

স্বামীকে সে কতদিন অনুনয়-বিনয় করিয়াছে, কতদিন তিরস্কার-অপমানও করিয়াছে, কিন্তু থিয়েটারের নেশা তাহাকে পাইয়াছে, সৈকত তাহাকে ফিরাইতে পারে নাই।

আজ সারাদিনটা তাহার মনে হইতেছিল—পূর্ব্ব জীবনের কথা।

পিসীমা যখন বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন যদি সে স্পষ্টই জানাইত বিবাহ করিবে না···

কিন্তু এদেশের কয়টা মেয়ে সে-কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিয়াছে? এক আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু কয়টা মেয়েই বা আত্মহত্যা করিতে পারে?

মুক্তি-স্নান

স্বামীর কাছে সে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিত, তবু সেই স্বামীকেই সে নিজের অজ্ঞাতে ভালোবাসিত, এবং সেই জন্যই সে তাহাকে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টাও করিতেছিল।

ব্রজেশ্বর ঘুম হইতে উঠিয়া প্রতিদিনকার মতই বারাণ্ডার পাশে জল ও মুখ ধোয়ার সরঞ্জাম পাইল, প্রতিদিনকার মত গরম চা-ও আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল।

বেশ একঘুম দিয়া দেহের সঙ্গে মনের গ্লানিও দূর হইয়া গিয়াছিল। আজকার আহার্য্য যে কোথা হইতে সংগ্রহ হইল, তাহা জানিবার দরকারও তাহার ছিল না।

চা দিয়া নিঃশব্দেই সৈকত বাহির হইয়া যাইতেছিল, ব্রজেশ্বর ডাকিল, "কথা আছে—শোন।"

সৈকত দাঁড়াইল।

ব্রজেশ্বর বলিল, "তোমার ওই বিচ্ছিরি নামটা বদলে ফেলতে হবে বাপু, কাল তোমার নাম নিয়ে ওরা বড্ড হেসেছে, ওদের স্ত্রীদের নামগুলি বেশ,—রমা, দুর্গা, দাক্ষায়ণী, কালীতারা,—আর তোমার মা-বাপ খুঁজে আর নাম পান নি,—রাখলেন কি না সৈকত! নাম বদলাও বাপু, ও নাম আর এ-যুগে চলবে না।"

গম্ভীর ভাবে সৈকত বলিল, "বদলালেই পারো।"

খুসি হইয়া উঠিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "বেশ বেশ, এই ত চাই। আচ্ছা তোমার নাম রাখলুম—বকুল, কেমন?"

সৈকত একটু হাসিল মাত্র, বলিল, "চমৎকার নাম।"

উৎসাহিত ব্রজেশ্বর বলিল, "সত্যি, 'বকুল' নামটা আমার খুব ভালো

াগে। আঃ·· তুমি যদি গান গাইতে পারতে, কি চমৎকারই না হতো! ? শৈলজা—কি সুন্দর গান গায় শুনেছ? বোষ্টমের মেয়ে, গলা তো নয় যেন বাঁশী! লোকে কি সাধে পয়সা দিয়ে ওকে বসিয়ে গান শোনে?"

বিকৃতমুখে সৈকত বলিল, "তা তুমিও শুনলে পারো।"

হো-হো করিয়া হাসিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "বেশ, তুমিও আমায় সবাইয়েব দলে ফেল। আমি কোনদিন ওর গান শুনেছি—বলতে পারো? সে-দিন ওদের বাড়ীর পাশ দিয়ে আসতে শুনতে পেলুম, সে গাচ্ছে—"

বলিতে বলিতে সে নিজেই সুব ধরিয়া দিল—

'অতি শীতল মলয়ানিল—,
অতি শীতল—'

সৈকত বলিল, "আমার উনোন জ্বলে যাচ্ছে। আজ দ্বাদশী, দিদির কাল উপোস গেছে।"

গান থামাইয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "হ্যাঁ, সে-কথা বেশ জানি। আচ্ছা, একটা কথা বলে যাও—'সৈকত' মানে কি? আমায় ওরা জিজ্ঞাসা করছিল, বল্‌তে পারলুম না। তোমার নাম যখন, মানেটাও নিশ্চয়ই তুমি জানো।"

হাসিও আসে, দুঃখও হয়।

অথচ ইহারাই বড় বড় গান মুখস্থ করে, অর্থ কি তাহাও হয় তো জানে না।

চাপা স্বরে সৈকত বলিল, "সৈকত মানে চিতা—"

চম্‌কাইয়া উঠিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "চিতা! যে চিতায় মড়া পোড়ে—?"

সৈকত মাথা কাত্‌ করিয়া জানাইল—তাই।

মুক্তি-স্নান

শিহরিয়া উঠিয়া ব্রজেশ্বর বলিল,—"সর্ব্বনাশ! এ-নামও মানুষে রাখে? আচ্ছা, মানে যখন জানতে, আমায় বললে না কেন? নামটা বদলে রাখতুম। উঃ, তোমার বাপ-মা বেছে বেছে বেশ নাম রেখেছেন তো—।"

সৈকত কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

উঠানের মাঝখানে শব্দ হইল—"রাধে-কৃষ্ণ, দুটো ভিক্ষে পাই মা—"

ব্রজেশ্বর মুখ বাড়াইল।

"একটা গান কর গো, ভিক্ষে এখনি মিলবে।"

বৈষ্ণবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি বললেই তো গাওয়া চলে না দাদা বাবু, বাড়ীর গিন্নি বলবেন তবে তো? কই গো বউদি, গান গাইব নাকি?'

রান্নাঘরের বারাণ্ডা হইতে সৈকত উত্তর দিল, "চাল বাড়ন্ত গো, আর একদিন গান শুনিয়ে ভিক্ষে নিয়ে যেয়ো।"

বৈষ্ণবী ব্রজেশ্বরের পানে তাকাইয়া হাসিল। বলিল, "শুনলে তো দাদা বাবু, গিন্নির ইচ্ছে নয় যে, গান করি। ..তা হ'লে চললুম।"

ব্রজেশ্বর জ্বলিয়া উঠিল, "চাল বাড়ন্ত কি? নিজেদের খাওয়া জোটে—একমুঠো ভিক্ষে দেওয়ার বেলা হ'ল চাল বাড়ন্ত! ও-সব চালাকি চলবে না সৈকত, চাল নিয়ে এস বলছি।"

রাগের মাথায় সৈকত নামের অর্থও সে ভুলিয়া গেল, নূতন নামটাও মনে পড়িল না।

দৃপ্ত নেত্রে স্বামীর পানে তাকাইয়া সৈকত বলিল, "তুমি চাল এনে দিয়েছ?"

ব্রজেশ্বর চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, "না এনে দিই—তবু ঘরে চাল আছে, বার কর বলছি।"

মুক্তি-স্নান

রান্নাঘরের শিকল তুলিয়া দিয়া দর্পিতকণ্ঠে সৈকত বলিল, "আগে বাজার হ'তে নিয়ে এসো—তারপর সব হবে।"

ব্রজেশ্বর রাগে কাঁপিতেছিল, তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও আর বাহির হইল না।

বৈষ্ণবী ব্যাপার দেখিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল। বলিয়া গেল,—"আবার একদিন আসব গো গিন্নি ঠাক্‌রুণ, সে-দিন চাল রেখো।"

সৈকত খুঁটিতে ঠেস দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, ব্রজেশ্বর আহত সর্পের মত গর্জ্জন করিতে লাগিল।

এই সময়ে দিদি স্নান করিয়া ফিরিলেন।

বয়স অনেক হইয়াছে,—ব্যারামে, সাংসারিক দুঃখ-কষ্টে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছেন, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, কানেও কম শুনিতে পান।

"বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে কে, বউ না?"

সৈকত উত্তর দিল, "আমিই দিদি।"

দিদি উঠানে দাঁড়াইয়া গামছা নিংড়াইতে নিংড়াইতে বলিলেন, "ও পাশটায় কে, ব্রজ নয়?"

ব্রজেশ্বর এইবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, "শোন দিদি, আদরের বউয়ের আক্কেলখানা শোন একবার। সকাল বেলায় বোষ্টমের মেয়ে, দ্বাদশীর দিনে তোমায় দু'খানা হরিনাম শুনাতে এলো, তোমার বউ কিনা তাকে দূর করে তাড়িয়ে দিলে! এ পাপে গেরস্তর ঘর জ্বলে-পুড়ে যাবে কি না তুমিই বল একবার।"

মুক্তি-স্নান

দিদির গলায় কণ্ঠী, প্রত্যহ তিনি তিলক-সেবা করিয়া থাকেন। গুরুদেব নবদ্বীপে বাস করেন, তিনি পরম বৈষ্ণব।

দিদি একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন! জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বউ, সত্যি? তুই নাম গান করতে দিস নি?"

দৃঢ়কণ্ঠে সৈকত বলিল, "না দিইনি, কারণ তার গানের বদলে তাকে কিছু দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, আমার ঘরে চাল পর্য্যন্ত নেই।"

দিদি বলিলেন, "কেন কাল বিকালে যে আট আনার চাল কিনে আনালি বউ—?"

বিকৃত মুখে ব্রজেশ্বর বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! ঘরে চাল থাকতে বললে কিনা চাল নেই! খিষ্টেনি মতই পেয়েছ তুমি। একমুঠা ভিক্ষে হাতে করে দিতে পারলে না। তোমার ইহকাল তো গেছেই সৈকত, পরকালও রইল না।"

"না হয় নরকেই পচে' মরব, স্বর্গ তোমাদেরই থাক্। আমি তোমাদের স্বর্গে যেতে চাই নে!"

রান্নাঘরের শিকল খুলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

৩

মহাসমারোহে "চন্দ্রগুপ্তে"র অভিনয়-রজনী আসিয়া পড়িল।

ক্ষুদ্র গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বৈকাল হইতেই দলে দলে লোক বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া অভিনয়-স্থল পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

ব্রজেশ্বর তখন শৈল বৈষ্ণবীর বাড়ীতে বসিয়া প্রাণপণে গানের সুর আয়ত্ত করিতেছে।

শৈল বৈষ্ণবী 'ছায়া'র সব গান জানে, সুরও করে চমৎকার।

আগে ব্রজেশ্বর এই মেয়েটিকে ঘৃণাই করিত, তাহাকে এড়াইয়া চলিত, কিন্তু সর্ব্বনেশে থিয়েটারই তাহাকে মাটি করিল, এবার 'ছায়া'র পার্ট লইয়া গানের জন্য তাহাকে শৈলর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতে হইল।

সৈকতের কানে এ-বার্ত্তা আসিয়াছিল। সে মুখখানা অন্ধকার করিয়া রহিল, স্বামীর সহিত কথাও বলিল না, কর্ত্তব্য কাজগুলি নীরবে করিয়া গেল।

গ্রামের সকলেই সে-রাত্রে থিয়েটার দেখিতে চলিয়া গেল, গেল না কেবল সৈকত। দিদি যদিও চোখে ভালো দেখিতে পান না, কানে ভালো শুনিতে পান না, থিয়েটারের নাম শুনিয়া তিনিও ছুটিয়াছেন।

সেদিন 'ছায়া'র অংশ নাকি খুবই সুন্দর হইয়া উঠিল, 'ছায়া'র গানে, কথায় সকলেই বিমোহিত হইয়া উঠিল।

ছোটবাবু স্বয়ং শেষসময় ষ্টেজের উপর দাঁড়াইয়া জানাইলেন—আজ ছায়া'র ভূমিকায় তরুণ অভিনেতা ব্রজেশ্বর যে সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, একটী সুবর্ণ পদক তিনি ইঁহাকে দিবেন। তিনি আরও স্বীকার করিতেছেন, যদি ব্রজেশ্বর কলিকাতায় যান, এবং সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন, তিনি সে জন্যও তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিবেন।

যখন বেশ সকাল হইয়া গিয়াছে, তখন সকলে ফিরিয়া আসিল।

তাহাদেরই সঙ্গে ফিরিলেন দিদি।

সৈকত তখন বাসন মাজিয়া আসিয়া সেগুলি বারাণ্ডায় সাজাইয়া রাখিতেছিল। দিদি বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলেন।

"আহা, কাল কি 'পিলেই' করলে ব্রজ, তুই তো গেলেনি বউ, শুনতিস চারিদিকে কি ধন্যি ধন্যি পড়ে গিয়েছিল। ছোটবাবু নিজে বললেন, তাকে সোনার কি একটা দেবেন, তা ছাড়া সে কলকাতায় যাবে—তাকে সব খরচ পত্তরও দেবেন।"

সৈকত শুধু তাকাইয়া রহিল।

বুঝিতে বাকী রহিল না, ব্রজেশ্বর এবার বাঁধন কাটিল। ক্ষুদ্র গ্রাম গোপালপুরে আর তাহার স্থান হইল না।

সে-দিন সারাদিন ব্রজেশ্বর বাড়ী আসিল না, ছোটবাবুর বাগান-বাড়ীতে মহা ভোজনের ব্যাপার। সকলেই আজ ব্রজেশ্বরের গৌরবে গর্ব্বান্বিত।

মুক্তি-স্নান

অনেক রাত্রে ব্রজেশ্বর বাড়ী ফিরিল।

দরজা খুলিয়া দিয়াই সৈকত বিছানায় শুইয়া পড়িল।

ব্রজেশ্বর খানিক ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইল, কি করিয়া সৈকতের সঙ্গে আলাপ করা যায় তাহাই সে ভাবিতেছিল। বৈষ্ণবীকে অপমান করার দিন হইতে সে সৈকতের সঙ্গে আর কথা বলে নাই—আজ হঠাৎ কি করিয়া কথা বলা চলে?

সৈকতও কয়েকদিন ইচ্ছা করিয়াই পাশ কাটাইয়া চলিতেছিল।

আজও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে-ই প্রথমে কথা বলিল—

"তুমি নাকি কলকাতায় যাচ্ছো—?"

ব্রজেশ্বর মুখ ফিরাইল। উত্তর দিল, "বোধ হয় যাব, ছোটবাবু পাঠাচ্ছেন।"

সৈকতের কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, অতিকষ্টে সে কণ্ঠ সংযত করিয়া বলিল, "থিয়েটারে যাবে তো?"

ব্রজেশ্বর হর্ষপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "তাই। ছোটবাবু কাল থিয়েটার দেখে একেবারে মোহিত হ'য়ে গেছেন, তিনি আমায় মেডেল দিচ্ছেন, খরচ-পত্র দিয়ে কলকাতায় পাঠাচ্ছেন। ··আমাদের রঘুনাথ যে থিয়েটারে আছে, আমিও সেইটাতেই ঢুকে পড়ব।"

সৈকত জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু সে-সব থিয়েটারে শুনেছি অনেক মেয়েও আছে।"

ব্যথা কোথায়, তাহা ব্রজেশ্বর বুঝিল। হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "থাকলই বা? তাতে তোমারই বা কি, আমারই বা কি?"

ভাঙ্গা-স্বরে সৈকত বলিল, "না, তোমার কিছু নয়, যাবে আমারই, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু আমার একটা কথা রাখবে? রাখ তো বলি।

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

চোখে জল আসিতেছিল। মুখখানা ফিরাইয়া লইয়া সৈকত বলিল, "তুমি কলকাতায় যেয়ো না, তোমার যা আছে, তাও থাকবে না,—তোমার সর্ব্বনাশ হবে।"

বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

বিস্মিত ব্রজেশ্বর খানিক পলকহীন নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পরই হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বাঃ, বেশ স্ত্রী তুমি: স্বামীর এ রকম উন্নতির কথা শুনলে স্ত্রী যখন আনন্দে আত্মহারা হয়, বরং স্বামীকে আরও এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তুমি তখন তোমার স্বামীকে আরও পেছনে টান। পতিভক্তির চরম দৃষ্টান্ত তুমিই দেখাচ্ছো।"

সৈকত একেবারে নীরব হইয়া গেল, আর একটী কথাও সে বলিল না।

কিন্তু ব্রজেশ্বর মনের আবেগে কত কথাই বলিতে লাগিল, সৈকত তাহার একটীরও উত্তর দিল না।

বিরক্ত হইয়া ব্রজেশ্বর নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল।

মুক্তি-স্নান

পরদিন সকালে সাতকড়ির মা এককালি কুমড়া দিতে আসিয়া থিয়েটারের কথা তুলিল।

"আহা, ব্রজ আমাদের কি 'পিলেই' করেছে গো, দেখে চোখের জল আর রাখতে পারি নে। কি সব তার গান, এখনও যেন কানে বাজছে! কি তার কথা, কি তার চেহারা! দেখে আমি তো প্রথমে চিনতেই পারি নি, ক্যাবলা আমায় জানিয়ে দিলে। সত্যি, কি চমৎকার তোকে মানিয়েছিল ব্রজ, হুবহু মেয়েমানুষ, কথাবাত্তারা, এমন কি দাঁড়াবার ভঙ্গিটুকু পর্য্যন্ত।"

ব্রজেশ্বর গর্ব্বপূর্ণ হাসি হাসিল।

সাতকড়ির মা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে, সত্যি? সোনার সেই কি দেওয়ার কথা—সেটা ছোটবাবু দেবেন তো?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "নিশ্চয়ই। একি তোমার আমার কথা পিসী, ছোটবাবু যা বলেন, কাজেও তাই করেন।"

সাতকড়ির মা বলিল, "আর ওই কলকাতায় যাওয়ার কথা?"

ব্রজেশ্বর উত্তর দিল, "সে তো দু'চার দিনের মধ্যেই যাব। ছোটবাবু নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন বলেছেন। দেখেছ পিসী, এই যে এতটা নাম-প্রতিপত্তি, এ কিন্তু তোমাদের বউমার মোটে সহ্য হচ্ছে না। যাতে আমি না যাই, সেজন্যে বার বার বলছে।"

গালে হাত দিয়া সাতকড়ির মা বলিল, "ওমা, সে কি কথা গো! বড়লোকের চোখে পড়েছে, ওর একটা হিল্লে হ'য়ে যাচ্ছে—তাতে তুমি বাধা দিচ্ছো, তুমি কি-রকমের বউ গা বউমা? ঢের ঢের বউ দেখেছি, তোমার মত বউ তো কখনও দেখিনি বাছা! ও যদি থিয়েটারে থাকে,

নাম তো আছেই, তা ছাড়া ওর টাকা খাবে কে? তখন কি এই কুঁড়ে-ঘরে তোমাদের থাকতে হবে বাছা, রঘুনাথের মত দোতলা কোঠা তৈরী করে ফেলবে যে!"

ব্রজেশ্বর খুসি হইয়া বলিল, "শোন গো, একবার কান পেতে শোন পিসী কি ব'লছে।"

সৈকত উত্তরও দিল না।

৪

দু'চার দিন পরে, ব্রজেশ্বর যেদিন সত্যসত্যই গ্রাম হইতে চলিয়া গেল, সেই দিন হইতে শৈল বৈষ্ণবীকেও কেহ গ্রামে দেখিতে পাইল না।

এই ব্যাপার লইয়া গ্রামের মধ্যে বেশ একটু গোলমালের সৃষ্টি হইল। অবশ্য মেয়ে-মহলেই বেশী।

সেদিন ঘাটে এই কথারই সমালোচনা চলিতেছিল। সৈকতও সেখানে উপস্থিত ছিল।

রায়েদের হেমাঙ্গিনী দাঁত মাজিতে মাজিতে বলিতেছিল, "মাগো। কী আক্কেল বল ব্রজেশ্বরের, ঘরে এমন সুন্দরী বউ থাকতে, কিনা একটা বোষ্টমের মেয়ে সঙ্গে করে পালালো!"

রামমণি কাপড় আছ্‌ড়াইতে আছ্‌ড়াইতে বলিল, "ছোটবেলা হ'তে থিয়েটারে ঢুকলেই ও-রকম হয় বাছা, ওতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নেই।"

নৃপবালা বলিল, "ছোটবাবুই কিন্তু ব্রজর মাথাটা খেলেন। তিনি যদি অতটা উৎসাহ না দিতেন, ব্যাপারটা এতদূর গড়াতে পারত না। এখন এই বউটা ওই হাবাকালা বুড়ো ননদকে নিয়ে কি করে ও-বাড়ীতে থাকে বল দেখি?"

সাতকড়ির মা বলিল, "থাকতেই হবে, স্বামীর ভিটে ছেড়ে কোথাও

যাওয়া তো চলবে না। একদিন তাকে আবার ঘরে ফিরতেই হবে, থাকবে কোন্ চুলোয় ?"

নৃপবালা জিজ্ঞাসা করিল, "আর বোষ্টমী—?"

হেমাঙ্গিনী বলিল, "তার জন্যে তোকে-আমাকে ভাবতে হবে না লো, সে নিজের পথ ঠিক করেই গেছে। তার রূপ আছে, গলা আছে, ভাবনা কিছুই করতে হবে না।"

সৈকত মাথা নীচু করিয়া ঘড়া মাজিতেছিল। ইচ্ছা হইল একবার শুনাইয়া দেয়—ছোটবাবু তাহাকে উৎসাহ দিয়াছেন বটে, তাহাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছ তোমরা ..."

কিন্তু সে-কথা ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া ফিরিয়া গেল, সৈকত স্নান করিয়া কলসী লইয়া উঠিল।

তাহার স্বামী একদিন আবার ফিরিবে, সেই দিনের প্রত্যাশায় তাহাকে এ-দিনগুলা কাটাইয়া দিতে হইবে।

মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য স্বামীর যাহাই থাক্, স্ত্রী তাহা ধরিবে না, স্বামীর সকল দোষই স্ত্রীর চোখে গুণ বিবেচিত হইবে—ইহারই নাম স্বামিভক্তি!

যে স্বামী বৈষ্ণবীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে, সেই স্বামী আবার যখন ফিরিবে, তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সেই কথাটাই কি সব সময়ে মনে পড়িবে না—তাহার স্বামী তাহাকে ভালোবাসিতে পারে নাই? সে ভালোবাসিয়াছে তাহার খেয়ালকে, তাই সে নিজের খেয়ালই মিটাইয়া চলিয়াছে!

দীর্ঘনিঃশ্বাস সে কোনমতেই দমন করিতে পারে না।

দেশের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাহার দুঃখে সমবেদনা জানায়, ইহাদের মধ্যে ছোটবাবুর দুঃখ প্রকাশ যেন বড় মর্মান্তিক।

সেদিন একটী লোকের হাতে দিয়া একখানি পত্র ও দশটা টাকা তিনি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পত্রে লিখিয়াছিলেন—তিনি বেশ জানেন, ব্রজেশ্বরের এই অধঃপতনের মূল কারণ তিনিই। সেই জন্য তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি ব্রজেশ্বরের সংসার প্রতিপালন করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

দিদি উৎকন্ঠিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কা'র পত্র বউ, ব্রজ কিছু লিখেছে নাকি?"

কঠিনমুখে সৈকত বলিল, "না, পত্র দিয়েছেন ছোটবাবু, দশটা টাকা দিয়ে পাঠিয়েছেন।"

দিদি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কেন?"

সৈকত বলিল, "আপনার ভাই যে চলে গেছে, এর জন্যে তিনি নিজেকে দোষী মনে করছেন, সেই জন্যে পাছে আমরা অনাহারে মরি, তাই আমাদের মাসে-মাসে সাহায্য করবার প্রস্তাব করেছেন।"

আনন্দে বৃদ্ধা দিদির চোখে জল আসিয়া পড়িল, "আহা বেঁচে থাকুন ছোটবাবু, ওঁর বাড-বাড়ন্ত হোক, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক। অমন লোক আর একটা এদেশে মিলবে না বউ, দুঃখী আতুরের দুঃখ-বেদনা ঘুচাতে উনি ছাড়া আর কেউ নেই।"

মনের আবেগে তিনি অনেক কথাই বলিয়া গেলেন, সে-সব কথা সৈকতের কানে গেল না। যে লোকটী পত্র ও টাকা আনিয়াছিল, বোধ হয় উত্তর পাইবার আশায় সে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার হাতে পত্র ও নোটখানি

ফিরাইয়া দিয়া সৈকত মিষ্টকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা বল তো বাবা, আমার কি এ-টাকা নেওয়া উচিত ? ধরলুম তোমার জামাই না হয় চলেই গেছেন, সে জন্যে উনিই বা আমায় সাহায্য করতে আসেন কেন ? এক দুঃখী গরীব বলে সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু এদেশে গরীব-দুঃখীর তো অভাব নেই ! তবু তো আমাদের মাথা গুঁজবার কুঁড়েটুকু আছে ; এমন লোকও আছে, যারা গাছতলায় বাস করে। উনি যদি সত্যিই দরদী বন্ধু হন, তাদের সাহায্য করুন না, তারা বাঁচবে।"

ভীম ছোটবাবুর তরফে দ্বারোয়ানের কাজ করিত। সে মাঝে মাঝে ব্রজেশ্বরকে ডাকিতে আসিত, সেই সূত্রেই সৈকতের সহিত তাহার পরিচয়। এই অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণীটীর মধ্যে সে নিজের মাকে খুঁজিয়া পাইয়াছিল, সেই জন্যই সে প্রাণ ভরিয়া ইহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিত। এই দুর্দিনে ভীম ছাড়া সৈকতের যথার্থ সুহৃদ্ এ-গ্রামে আর কেহ ছিল না। তাহার জন্যই আজও সৈকতকে অনাহারে কষ্ট পাইতে হয় নাই।

জাতিতে সে চণ্ডাল হইলেও, মন তাহার অনেক ব্রাহ্মণের চেয়েও উন্নত ছিল। গ্রামের ভদ্রবংশীয়েরা তাহার ছায়া মাড়াইতেন না,—এই ভয়ে সে সতর্ক ভাবে পাশ কাটাইয়া চলিত।

সৈকতের কথা শুনিয়া ভীমের অন্ধকারপূর্ণ মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"ঠিক কথা বলেছ মা, ছোটবাবুর মতলব ভালো নয় বলেই আমার মনে হয়। যাই হোক, তুমি সাবধানে থাকলে, ছোটবাবুর এতটুকু ক্ষমতা হবে না যে তোমার অপমান করবে। আচ্ছা আমি চললুম মা, গিয়ে ছোটবাবুকে ঠিক এই কথাই বলব।"

মুক্তি-স্নান

খানিক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল, কুর্ত্তার পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া সৈকতের পায়ের কাছে রাখিয়া বলিল, "ঘরে চাল আছে, এটা দিয়ে তরকারী-মাছ কিনো মা।"

সৈকত অপ্রসন্ন মুখে বলিল, "একি ব্যাপার ভীম, রোজ রোজ তোমার এ-অত্যাচার তো ভাল নয়।"

হাসিমুখে বলবান্ লোকটি বলিল, "মা হ'লে ছেলের অনেক আব্দার সইতে হয়, এ-ও তেমনি একটা আব্দার। ভয় নাই মা, এ আমার মাইনের টাকা নয়; উপরি পাওনা—তাই তোমায় দিয়ে গেলুম।"

সে আর দেরী না করিয়া চলিয়া গেল।

সৈকত টাকাটা তুলিয়া লইল। তাহার দুইটা চোখ তখন জলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা নিয়েছ?"

সৈকত গম্ভীর ভাবে বলিল, "না, ফেরত দিলুম।"

দিদি স্তম্ভিত ভাবে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। খানিক পরে বলিলেন, "ফেরত তো দিলে, কিন্তু ছোটবাবু কি মনে করবেন সেটা ভেবেছ?"

সৈকত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "যা মনে করেন করবেন। আমরা তাঁর দান নেবার উপযুক্ত পাত্রী কি-না সে-বিবেচনা আমরাই করব তো? বিবেচনা করে দেখলুম, উপযুক্ত নই। সেই জন্যেই ফিরিয়ে দিলুম।"

৫

সেদিন সন্ধ্যাবেলা···

দিদি বারাণ্ডায় বসিয়া মালা ঘুরাইতেছিলেন, সৈকত উঠানের মাঝখানে তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রণাম করিতেছিল।

দিদি মালা জপিতে জপিতে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিলেন, "ছোঁড়াটা গেল—একটা খবর পর্য্যন্ত দিলে না। কোথায় গেল—কি হ'ল কে জানে। থিয়েটারেই যা আর যেখানেই যা, একটা খবর দেওয়া তো তোর উচিত ছিল।"

সৈকত প্রণাম সারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সাম্‌নের দিকে চাহিতেই দৃষ্টি পড়িল, বাড়ীর দরজার উপরে কে দাঁড়াইয়া আছে।

সৈকত জিজ্ঞাসা করিল,—"কে—কে ওখানে ?"

"আমি—"

লোকটি অগ্রসর হইয়া আসিলেন। সৈকত তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিল—তিনি স্বয়ং ছোটবাবু!—

মাথায় কাপড়টা টানিয়া দিয়া সে বারাণ্ডায় উঠিয়া দাঁড়াইল।

দিদি মালা জপ স্থগিত রাখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, "বউ,

একখানা আসন দাও গো, অনেক ভাগ্যিতে ছোটবাবু আজ নিজে এসেছেন আমাদের কুঁড়ে ঘরে—"

ছোটবাবু আসন দিবার আগেই একপাশে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "থাক্, আসন আর দিতে হবে না, এই আমি বেশ বসেছি।"

দিদি দরজার আড়ালে দণ্ডায়মানা বধূর হাত হইতে আসনখানা আনিয়া ছোটবাবুর পাশে বিছাইয়া দিয়া বলিলেন, "না না, আসনখানায় উঠে বোসো বাবা, মাটিতে বসবে কেন?"

বৃদ্ধার অনুনয়-বিনয়ে অগত্যা ছোটবাবু আসনখানা টানিয়া লইয়া বসিলেন।

"হ্যাঁ, তারপর আপনাদের সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, এর মীমাংসা না করে আমি সহজে ছাড়চি নে। কাল আমি টাকা দিয়ে পাঠিয়েছিলুম, সে-টাকা ফেরত দিলেন কেন?"

দিদি অন্তরালবর্ত্তিনীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সে কি আমি করেছি বাবা, করেছে আমার ওই ভাজ। বার বার বললুম—টাকাটা নাও, ফেরত দিলে ছোটবাবুর অপমান হবে, কিন্তু ও কি আমার কথা শোনে, জিদ করে টাকাটা পাঠিয়ে দিলে। বললে আবার রাগ কত!"

ছোটবাবু দরজার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এ-ব্যাপারটায় সত্যিই আমাকে অপমান করা হয়েছে। আমি কেন যে টাকা পাঠিয়েছিলুম, তা বিশদভাবে পত্রে লিখতে পারি নি।—আজ ব্রজেশ্বর যে সংসারের কথা না মনে করে চলে গেছে, এর জন্যেই দায়ী আমিই, আর কেউ নয়। তাকে আমি যদি থিয়েটারে যেতে উৎসাহ না দিতুম, যদি কলকাতায় রঘুনাথকে বলে সব ঠিক না করে দিতুম, সে চলে যেত না। এ-পাপ

আমারই, আমি তাই এর প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। সে যেমন করেই হোক নিজের সংসার চালাত; তার অভাবে কী করে আপনাদের দিন চলবে? এই জন্তেই আমি ভেবেছিলুম, যতদিন সে না ফিরে আসে— আমি আপনাদের সংসার প্রতিপালনের ভার নেব।"

দরজার পাশ হইতে কেবল কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ শুনা গেল, কোনও কথার আওয়াজ কানে আসিল না।

ছোটবাবু বলিলেন, "আমি আপনাদের সঙ্গে আজ সেই কথাই বলতে এসেছি,—আপনারা যদি টাকা না-ও নেন, আমি একমাসের মত জিনিস পত্র কিনে পাঠিয়ে দেবই, ফিরিয়ে দিলে চলবে না। যদি ফিরিয়ে দেন, জানব, আপনারা আমাকে ক্ষমা করেন নি! আর সেইটাই আমার জীবনে দুর্ব্বিষহ বেদনা দিতে জেগে থাকবে।"

দরজার পাশ হইতে চাপা সুরে সৈকত বলিল, "কিন্তু আপনার দেওয়া জিনিস নিতে আমাদের যে কতটা নিগ্রহ সইতে হবে, সেটা বোধ হয় আপনি ভাবেন নি?"

ছোটবাবু প্রথমেই কথাটা বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "কিসের নিগ্রহ বুঝলুম না তো।"

সৈকত উত্তর দিল, "দেশের লোক জানতে চাইবে—আপনার এ-সাহায্য করবার কারণ কি? তখন তার কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত সত্যিই আমাদের কিছু থাকবে না। গরীব বলে যদি দান করেন, দেশের লোক প্রমাণ দেবে —আমাদের চেয়ে ঢের বেশী গরীব লোক আছে, তাদের মাথা গুঁজবার জায়গাটুকু পর্য্যন্ত নেই।"

ছোটবাবু খানিকটা হো হো করিয়া হাসিয়া লইলেন। তাহার পর

গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সেটা আমার খুসি, আমার খেয়ালেই আমি যে দান করে যাই, সে-কথা দেশের লোক বেশ জানে। দেশের লোককে রমেন্দ্রনাথ কোনদিনই ভয় করে নি, দেশের লোকের পানে তাকিয়ে কোন কাজও সে কোনদিন করে নি, তাও দেশের লোক জানে। এ-ও তারা বেশ জানে—কোনদিন আমি কোন দরকারে ওদের দরজায় গিয়ে দাঁড়াব না—ওরাই যেমন বরাবর আমার দরজায় এসে দাঁড়ায়, তেমনই দাঁড়াবে। আপনি যদি দেশের লোকের ভয়েই আমার জিনিস ফিরিয়ে দেন, জানবেন সে-ভয় একবারেই অমূলক—ওর মূলে কিছু নেই।"

সৈকত চুপ করিয়া রহিল।

মৌনতাই সম্মতির চিহ্ন—তাহা ছোটবাবু বেশ জানিতেন, সেই জন্যই হৃষ্টমনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "কাল সকালেই লোক আসবে জিনিসপত্র নিয়ে। আপনারা কিছু ভাববেন না, আমায় পর মনে করেন না, নিজের লোক ভেবে যখন যা দরকার আমায় অসঙ্কোচে চাবেন।"

তিনি চলিয়া গেলেন।

শ্রাবণের নীল আকাশে তখন অসংখ্য তারা ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে, উদাস বাতাস শন্ শন্ করিয়া বহিয়া আসিতেছে। বারাণ্ডার ঠিক নীচে কয়েকটা বেলফুলের গাছে ফুল ফুটিয়া মৃদুমন্দ সুন্দর গন্ধ ছড়াইয়া দিতেছে।

সৈকত বারাণ্ডায় আসিয়া বসিল।

পুনরায় মালা জপ স্থগিত রাখিয়া দিদি গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "কি সুন্দর মানুষ বল দেখি বউ? ব্রজ এই জন্তই বলতো—ছোটবাবু মানুষ

নন, শাপভ্রষ্ট দেবতা। আজ ওঁর কথা শুনতে শুনতে আমার কেবল ব্রজর কথাই মনে পড়ছিল বউ। ভদ্রলোক কি রকম কষ্ট পেয়েছেন দেখলে? সব দোষ যেন ওঁরই।"

রাত্রে বিছানায় শুইয়া সৈকত ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

কি করিবে—কোন উপায় নাই। প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ছোটবাবুর এ-দান তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, নহিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ছোটবাবুর চরিত্রে এ-পর্য্যন্ত কেহ কোনদিন দোষ দেয় নাই, তথাপি মানুষের মন তো। বড় বড় মুনি-ঋষিদেরও পদস্খলন হইয়াছিল, ছোটবাবুও যে চিরকাল জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মের মত জীবন যাপন করিতে পারিবেন, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

কিন্তু না, এ-সব কথা ভাবিবারই বা দরকার কি? এ-সব দিকে তাকাইবারও সৈকতের দরকার নাই। যে যেমন লোকই হোক, তাহার দান গ্রহণ করিতে এরূপ অসহায় অবস্থায় পাপ নাই। সে যদি নিজেকে সংযত রাখিতে পারে, কেহই তাহার সামনে দাঁড়াইতে পারিবে না।

পরদিন সকালে দু'জন লোক বাঁকে করিয়া একমাস চলিবার মত অনেক জিনিসই আনিয়া দিয়া গেল।

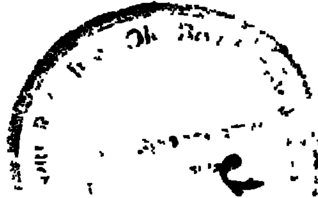
সে সব গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে দিদি বলিলেন, "আজ কেবল আমার ব্রজর কথাই মনে পড়ছে বউ, হতভাগাটা একখানা পত্রও দিলে না!"

রুদ্ধকণ্ঠে সৈকত বলিল, "আমরা যেমন তার জন্যে কেঁদে মরছি দিদি তার তো সে-সব বালাই নেই, সে তো এই জন্যেই গেছে। ঘরের বন্ধন

ভুলে গেছে। সে এখন নতুন পথে চলেছে।...আমার কথা ছেড়ে দিই, আপনি যে তার দিদি, তাকে সন্তানের মত হাতে গড়ে' মানুষ করেছেন, সে-কথাটা'ও একবার ভাবলে না এই সব কথা ভাবতে গেলে ভেবে আমার বড় কষ্ট হয় দিদি।"

দিদি শুধু হাসিয়া বলিলেন, "আমার কথা না তোলাই ভালো। বুড়ো হয়েছি, আর কয়টা দিনই বা বাঁচব, কিন্তু তোর কথাই আমি যে ভাবছি বউ। এখনও কতকাল বাঁচবি, কে তোকে দেখবে, কে তোর খাওয়া-পরার ভার নেবে—আমি তাই শুধু ভাবছি।"

ক্ষীণকণ্ঠে সৈকত বলিল, "ভগবান্ দেখবেন।"



৬

ছোটবাবু যাহাই বলুন না, যতই সাজা দিন না, গ্রামে বেশ কানাঘুষা চলিতে লাগিল। অনেকে আড়ালে মুখ মুচ্‌কাইয়া হাসিল। অথচ সাম্‌না সাম্‌নি কেহই কোন কথা বলিতে পারে না। কেন না, ধনী ছোটবাবু অনেকেরই অনেক সময়ে সাহায্য করেন।

সামনেই একটা গঙ্গাস্নানের যোগ আসিয়া পড়িয়াছিল।

দিদি সেদিন পাড়া হইতে শুনিয়া আসিলেন, অনেক লোক এই যোগে গঙ্গাস্নান করিতে কলিকাতায় যাইবে; ছোটবাবু সকলকেই নিজের বাড়ীতে স্থান দিবেন বলিয়াছেন।

আজ কয়েকদিন হইল ছোটবাবুর স্ত্রীর অসুখ হওয়ার জন্য তিনি কলিকাতায় তাঁহার নিজের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন, কিছুদিন এখন ওখানেই থাকিবেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—গ্রামের যাহারা গঙ্গাস্নানের জন্য কলিকাতায় যাইতে চায় তাহারা তাঁহার বাড়ীতে দু'একদিন থাকিতে পারে।

দিদি বলিলেন, "চল না বউ, আমরাও দু'জনে গিয়ে চানটা করে আসি। জন্মে কখন তো এ-বাড়ী ছেড়ে বার হ'তে পারলুম না। সেই সেবার নবদ্বীপে গিয়ে যা গঙ্গাস্নান করে এসেছি। কলকাতায় কখনও গেছি বলে তো মনে পড়ে না। ছোটবাবু যখন এত লোককে নিজের বাড়ীতে

জায়গা দেবেন, তখন আমাদেরও দেবেন। কখনও তাড়াতে পারবেন না। চাই কি ওখানে গেলে ব্রজর সঙ্গেও দেখা হতে পারে। তখন তাকে জোর করে ধরে আনাও চল্‌বে। সত্যি, আমরা যদি গিয়ে তার হাতে ধরি, সে কক্ষনো ছেড়ে যেতে পারবে না।"

এক যাত্রায় তিনি রথও দেখিতে চান, কলাও বেচিতে চান।

সৈকতের মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "গঙ্গাস্নানের ফলটাই কেবল ফলবে দিদি, আপনার ভাইকে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিন।"

দিদি হাল ছাড়িলেন না, বলিলেন, "দেখাই যাক না। সে কোন্ থিয়েটারে ঢুকেছে, ছোটবাবু তা বেশ জানেন। তিনি ডেকে পাঠালে তাকে আসতেই হবে। না বৃন্ধু, এত বড় নেমকহারাম কখনও সে হতে পারবে না।"

সৈকত উত্তর না দিলেও, যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল।

কয়েকটা টাকা হাতে জমিয়াছিল, যাওয়া-আসার খরচ ইহাতে নির্ব্বাহ হইবে।

সেদিন ঘাটে মালতীর মুখে সে শুনিয়াছিল, তাহার স্বামী থিয়েটারে ঢুকিয়াছে এবং নামও মন্দ করে নাই। মালতী বলিয়াছিল, "একবার তুমি নিজে যেমন করে পারো দেখে এসো বউদি, সত্যি অবাক্ হয়ে যাবে। রঘুনাথ দা'ও সেই থিয়েটারে গেছে বটে, তার চেয়ে অনেক ভালো করে ব্রজ দা।"

সে আরও বলিয়াছিল, "আর একটা কথা জানো বউদি, আমাদের সেই বোষ্টমীও সেই থিয়েটারে আছে। চেহারা যা হয়েছে, দেখে চিন্‌বার

যো নেই। ওর চেহারা আর গানের জন্যে শুনলুম ওর নাকি, অনেক মাইনে হয়েছে। মাইরি, তুমি নিজে যদি একবার যাও, তাকে আচ্ছা করে বোঁটিয়ে ব্রজদাকে জোর করে টেনে আনতে পারো; নইলে ব্রজদা কক্ষনো আসবে না—এ ঠিক জেনো।"

এই সুযোগ যখন পাওয়া গিয়াছে তখন হারানো উচিত নয়। আর কিছু না হোক, সে থিয়েটার দেখিবেই, স্বামীকে একবার ডাকাইয়াও তাহার কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে।

ইহারই দুদিন পরে একদিন ঘরে তালা দিয়া ভীমকে দেখাশুনা করিতে বলিয়া দিদি ও সৈকত কলিকাতা যাত্রা করিলেন। গ্রামের কয়েকটী বৃদ্ধা সঙ্গে ছিলেন,—দুই-একটী ছেলেও ছিল।

শ্যামবাজারে ছোটবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী, স্থানের অভাব হইল না।

ছোটবাবুর স্ত্রী সেখানে নাই, মুঙ্গেরে তাঁহার পিত্রালয়ে গিয়াছেন; বাড়ীতে ছোটবাবু একাই ছিলেন।

দ্বিতলের কয়েকটা ঘর তিনি অভ্যাগতদের জন্য ছাড়িয়া দিলেন। একখানা ঘর সৈকত ও দিদি দখল করিলেন। পুরুষদের সঙ্গে থাকিতে সৈকত রাজি হয় নাই।

গঙ্গাস্নানের পর্ব্ব মিটিয়া গেল, যাত্রীরা আবার দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দল বাঁধিয়া তাঁহারা যেদিন কালীঘাটে চলিলেন

৭

ছোটবাবু 'বক্স' রিজার্ভ করিয়া লইয়াছেন। দুইখানি চেয়ারে সৈকত ও দিদিকে বসাইয়া নিজেও একখানি চেয়ারে বসিয়াছেন।

মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় সৈকত থিয়েটার দেখিতেছিল।

সেদিনকার অভিনয়ে প্রবীণ নায়ক ছিল তাহার স্বামী ব্রজেশ্বর

কি সুন্দরই না দেখাইতেছিল তাহাকে। কি সুন্দর তাহার ক· বলিবার ভঙ্গি—চলিবার ভঙ্গি। সৈকত মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া ছি· কি যে ভাবিতেছিল, তাহা দিদিব ও-পাশে উপবিষ্ট ছোটবা· জানেন না।

কিন্তু ওই মেয়েটী—যে নায়িকা সাজিয়াছিল, সে সেই শৈল বৈষ্ণ· নয়?

একদিন যে উদরান্নের জন্য ভিক্ষা করিয়া পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াই আজ সে থিয়েটারের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী...

সৈকতের চোখ দুটি জ্বলিতে লাগিল।

ছোটবাবু তখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই দিদিকে বলিতেছিলে "ওকে খবর দিয়েছি, যেন থিয়েটার ভাঙ্গলেই আমাদের সঙ্গে একব এসে দেখা করে। অবশ্য দেখা যে করবে তা মনে হয় না, তবু দে যাক না কি করে।"

দিদি বলিলেন, "যদি না-ই আসে, ওখানে গেলে দেখা করতে পারব না ?"

ছোটবাবু চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওখানে কি ভদ্রলোকের মেয়ে-ছেলেরা যায় ? আর গেলেও ওখানে ঢুকতে দেবে না, তাড়িয়ে দেবে।"

সৈকত ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কি জানতে পেরেছেন—আমরা এসেছি ?"

একটু হাসিয়া ছোটবাবু বলিলেন, "পাগল, সে-কথা জানলে ও কি আসবে ? আমি একা এসেছি, তাই ও জানে। শুনেছি, ওরা নাকি এবার ফিল্মে নামবে। শীগ্গীর বম্বে চলে যাচ্ছে, সেখানকার কোন ফিল্ম কোম্পানীতে ঢুকছে।"

সৈকতের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইয়া ষ্টেজের পানে চাহিল।

অভিনয় চলিতেছিল।

একবার যেন মনে হইল ব্রজেশ্বর মুখ তুলিয়া উপরের বক্সের পানে চাহিল, কি কথা বলিতে-বলিতে হঠাৎ সে যেন ভুলিয়া গিয়া থামিয়া দাঁড়াইল।

পর মুহূর্ত্তে সে নিজেকে সামলাইয়া লইল, ইহার পর সে আর একবারও মুখ তুলিয়া উপরের পানে চাহিল না।

সেই মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহার মুখের উপর যে ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সৈকত দেখিতে পাইল। থিয়েটার দেখিবার প্রবৃত্তি তাহার যেন আর রহিল না। এইবার উঠিতে পারিলে সে যেন বাঁচে।

মুক্তি-স্নান

ছোটবাবুর আদর-আপ্যায়নের শেষ নাই—চা, লেমনেড, সরবৎ, পান প্রচুর আমদানী করিতেছিলেন, সৈকতকে খাওয়াইবার জন্ম বারবার জিদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সৈকত কিছুতেই কিছু খাইল না।

সাড়ে-বারটার সময় থিয়েটার শেষ হইয়া গেল, লোকজন সব বাহির হইতে লাগিল।

সৈকত ছোটবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "উঠুন।"

ব্যগ্রভাব দেখাইয়া ছোটবাবু বলিলেন, "রোস, সে আসতেও পারে।"

সৈকত মাথা নাড়িয়া বলিল, "না তিনি আসবেন না। অনর্থক আর রাত করে দরকার নেই, আপনি চলুন।"

ছোটবাবু বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "আসবে না কি করে জানলে তুমি? সে যখন বলেছে আসবে, তখন নিশ্চয়ই আসবে। ব'সই না আর মিনিট-পাঁচেক, দেখা যাক আসে কি না।"

কিন্তু পাঁচ মিনিট অতীত হইয়া গেল—কেহই আসিল না। রঙ্গালয় শূন্ত হইয়া গেল, একটী দর্শকও আর রহিল না।

ছোটবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হতাশ ভাবে বলিলেন, "নাঃ, সত্যিই সে এলো না। আমি বেশ জানি সে আসবে না। দেশের কারও সঙ্গে দেখা করবে না—পাছে কেউ তাকে কোনও কথা বলে। নইলে আমি তু'দিন খবর দিলুম, আজ এখানে এলুম পর্য্যন্ত—তবু সে একবার এলো না!"

তিনজনে অগ্রসর হইলেন।

সামনে মোটর দাঁড়াইয়া ছিল।

ছোটবাবু সন্তর্পণে হাত ধরিয়া বৃদ্ধা দিদিকে আগে উঠাইয়া দিলেন। সৈকত উঠিতে গিয়া কাপড় বাধিয়া পড়িবার মত হইতেই ছোটবাবু দুই হাতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সম্মুখে আসিয়া পড়িল একটা লোক, সে ব্রজেশ্বর।

অভিনয় করিবার সময় ষ্টেজের ভিতর হইতে 'বক্সে' সে এই তিন জনকে দেখিতে পাইয়াছিল,—কি একটা কথা বলিবার জন্যই সে আসিতেছিল, কিন্তু এই দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে দ্রুতপদে ফিরিয়া গেল।

জোর করিয়া ছোটবাবুর হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সৈকত বলিল, "ওই যে উনি, ছুটে চলে গেলেন, ওঁকে ডাকুন—ডাকুন।"

ছোটবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ওকে ডাকা মিছে, সৈকত! ও ভাবেনি যে তোমরা এখানে এসেছ, আমি একা আছি জেনে আসছিল, তোমাদের দেখে ছুটে পালিয়েছে।"

সৈকত মুহূর্ত্তমাত্র দীপ্তচোখে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল, সে-দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া ছোটবাবু মুখ ফিরাইলেন।

ধীরপদে সৈকত মোটরে উঠিয়া বসিল, ছোটবাবু উঠিতে যাইতেছিলেন —দরজাটা জোরে চাপিয়া ধরিয়া সৈকত বলিল, আপনি সামনে গিয়ে বসুন, এখানে জায়গা নেই।"

থতমত খাইয়া ছোটবাবু খানিক দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইতিপূর্ব্বে যে-সব ব্যাপার ঘটিয়া গেল দিদি তাহার কিছুই জানিতেন না।

বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ওকি বউ, ওঁকে উঠতে দিচ্ছিস নে কেন ?"

সৈকত শান্তকণ্ঠে বলিল, "এখানে আর জায়গা কই, দিদি ? সামনের সিটে একজনের জায়গা রয়েছে, উনি তো বেশ যেতে পারবেন।"

নীরবে ছোটবাবু ড্রাইভারের পাশে উঠিয়া বসিলেন।

বাড়ীতে পৌছিয়া দিদির বিছানা ঠিক করিয়া দিতে দিতে সৈকত বলিল, "কালই কিন্তু বাড়ী চলে যাব দিদি, আমার কলকাতা আর ভালো লাগছে না।"

ভালোমানুষ দিদি বলিলেন, "যে-জন্যে আসা তাই যখন হ'ল না, এখানে থেকে আর লাভ কি বল ; বাড়ী চলে যাওয়াই ভালো—"

সৈকত বলিল, "আর এক কথা দিদি, তুমি কালই ছোটবাবুকে বলে দিয়ে যেয়ো, আমাদের জন্যে আর ওঁকে কিছু দিতে হবে না। আমি ঠিক করেছি এবার হতে কাজ-কর্ম্ম করব, তাতেই যেমন করে হোক, দিন চলবে।"

আশ্চর্য্য হইয়া দিদি বলিলেন, "কাজ-কর্ম্ম আবার কি করবি, বউ ?"

সৈকত বলিল, "বাড়ী গিয়ে সব ঠিক করব। এখনই সে-সব বলবার তোমার দরকার নেই।"

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। সেই জন্যই পরদিন ভোর হইতে বৃদ্ধা দিদির ভেদ-বমি আরম্ভ হইল।

ছোটবাবু ডাক্তার দেখাইতে বাকি রাখিলেন না, সৈকত হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল।

মুক্তি-স্নান

বেলা তিনটার সময় দিদি ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

সৈকতের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, এখন সে কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না।

ছোটবাবু চিন্তাকুলমুখে বলিলেন, "তোমার তো এখন দেশে যাওয়া হতে পারে না সৈকত, এখানেই শ্রাদ্ধ সেরে যেতে হবে। ব্রজকেও একবার খবর দিতে হবে।"

হতাশভাবে সৈকত বলিল, "খবর দিলেও তিনি আসবেন না।"

ছোটবাবু বলিলেন, "তাই কি হতে পারে? হাজার হোক তার বড় বোন তো বটে, শ্রাদ্ধের অধিকারী সে—শ্রাদ্ধটা করবে না?"

কিন্তু দুই চার দিন পরে, তিনি মলিনমুখে আসিয়া জানাইলেন—ব্রজেশ্বরের সঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহার দেখা হইয়াছিল, সে বম্বে চলিয়া গেল। একখানা পত্র নাকি সে সৈকতকে পাঠাইবে, হয়তো সেখানা আজ-কালের মধ্যেই সৈকত পাইবে।

সৈকতের মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। সেই রাত্রির কথা তার মনে পড়িল—ব্রজেশ্বর ছুটিয়া আসিতেছিল,—ঠিক সেই সময়েই ছোটবাবু তাহাকে দুইহাতে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়াছিলেন। এক ঝাপ্টায় সে ছোটবাবুর হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু তখন ব্রজেশ্বর চলিয়া গিয়াছে! এ-দৃশ্যে তাহার মনে যে কি-ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা সৈকত বুঝিয়াছে। সেই রাত্রির কথা মনে করিতে সে আজ শিহরিয়া উঠে, তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া যায়।

মুক্তি-স্নান

সেদিন শ্রাদ্ধ সবে মাত্র শেষ করিয়া সে উঠিয়াছে, সেই সময় ভৃত্য একখানা খামে-মোড়া পত্র রাখিয়া গেল।

পত্রখানার পানে তাকাইয়া সৈকত বুঝিল—এ পত্র ব্রজেশ্বর লিখিয়াছে।

সৈকত তাড়াতাড়ি পত্রখানা খুলিয়া ফেলিল। ব্রজেশ্বর লিখিয়াছে—

—"আমি তোমায় পত্র দিতুম না সৈকত, কিন্তু অনেক ভেবেই আবার আজ লিখতে বসেছি।

"শুনলুম আমার দিদি মারা গেছেন,—বাঁচলুম! সত্যিই আমার একটা বাঁধন কাটলো। আমি আমার মাতৃসমা দিদির জন্যে সত্যিই কোনদিন শান্তি পাই নি, এবার একেবারেই নিশ্চিন্ত হয়েছি। পেছনের পানে আর আমায় চাইতে হবে না, আমি সামনের দিকে এবার হতে বে-পরোয়া ভাবে ছুটবো।

"হ্যাঁ, এইবার আসল কথা বলি শোন। খেয়ালের বশেই, আমি শৈলকে নিয়ে চলে এসেছিলুম। এসে, এখানে বেশ প্রতিষ্ঠা পেলুম, অর্থও পাচ্ছিলুম মন্দ নয়। চোখের নেশা আমার কেটে এসেছিল, আমি মনে করেছিলুম সেই সপ্তাহে বাড়ী যাব, তোমাকে আর দিদিকে নিয়ে আসব।

"অনেকখানি আশা নিয়ে একটা বাড়ীও ভাড়া করেছিলুম, সেখানা সাজিয়েও ছিলুম, ভেবেছিলুম, বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত তোমায় কেবল দুঃখই দিয়েছি, এবার তোমায় সুখী করব।

"কিন্তু ভুল আমার ভেঙ্গে গেল!

"এযে কী নিদারুণ আঘাত—তা তুমি বুঝবে না সৈকত। তুমি

অবনতের পথে গেছ—একথা আমি প্রথমে লোকের মুখে শুনে বিশ্বাস করতে পারি নি, কিন্তু চোখেও তো দেখলুম!

"দেখলুম—তুমি ছোটবাবুর সঙ্গে বসে থিয়েটার দেখছ। তারপরে দেখলুম তুমি ছোটবাবুর দুই হাতের মধ্যে—একেবারে তাঁর বুকের 'পরে!

"আমার মনে হল—যেন আমায় সাপে ছোবল দিয়েছে! জানি নে সে-জ্বালা এত তীব্র কি-না! আমি থমকে দাঁড়ালুম—একবার মনে হল তোমাদের দুজনকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিই, কিন্তু সামলে গেলুম।

"আজও বুকে সেই জ্বালা—সহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই।

"সাজানো সংসার ভেঙে ফেললুম। অনেক আগে হতেই বম্বের একটা ফিল্ম কোম্পানী আমায় ডেকেছিল, আমি যাই নি। এবার সেখানেই চললুম, আর এখানে ফিরব না।

"তুমি নিশ্চিন্ত থাক, নির্ভয়ে থাক, কেউ কোনদিন তোমার সামনে আসবে না সৈকত। এর জন্যে আমি তোমায় দোষ দিচ্ছি নে,—মানুষ অনেক সময় অভাবের তাড়নায় সবই করে, তুমিও করেছ। দোষ তোমার নয়—দোষ আমার।

"আমি এসেছিলুম, চলেও গেলুম—আমার কথা হয়তো কোনদিন তোমার মনেও হবে না, অথবা যদিও মনে হয়—আমায় তুমি খেয়ালী, চরিত্রহীন, দুর্দান্ত অত্যাচারী বলেই জানবে। তুমি কোনদিনই ভাববে না—এই অত্যাচারীর বুকের মধ্যেও সত্যিকার ভালোবাসা একটু ছিল, তোমায় সুখী করবার ইচ্ছা তার মনে ছিল, কিন্তু কিছুই হল না। দুঃখ রইলো, আমি তোমায় জানাতে পারলুম না—তোমায় ভালোবাসতুম।

"যাক···সে-সব কথায় আর দরকার নেই, তোমার কাছ হইতে জন্মের মত বিদায় নিলুম।" ইতি—ব্রজেশ্বর।

পত্রখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িল, বজ্রাহতার মতই সৈকত বসিয়া রহিল।—তাহার চোখের সামনে পৃথিবীর অস্তিত্বও যেন তখন ছিল না, সব শূন্যময় হইয়া গিয়াছিল।

৮

সৈকত গ্রামে ফিরিয়া আসিল। ছোটবাবু আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু সৈকত তাঁহার কোন কথা শুনে নাই। সে একাই যখন আসিবার ব্যবস্থা করিল, তখন অগত্যা ছোটবাবু নিজের সরকারকে তাহার সঙ্গে দিলেন।

বলিয়া দিলেন, "জানি, তুমি গ্রামে গিয়ে আর থাকতে পারবে না, এর মধ্যে গ্রামে অনেক কথাই হয়েছে। এখনও হচ্ছে। যদি সেখানে না টিকতে পারো, আমার এখানেই এসো সৈকত, আমার ঘরের দরজা তোমার জন্যে চিরকালই খোলা থাকবে জেনো।"

এতখানি ভরসা পাইয়াও সৈকত তাঁহাকে একটা ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দিল না।

মানুষের সভ্যতার আড়ালে যে এতখানি ক্রূরতা থাকিতে পারে—তাহা সে আগে জানিত না। সংসারের সঙ্গে পরিচয় তাহার অতি সামান্য, বাহিরের পরিচয়ও এতটুকু পায় নাই।

একমাস পরে গ্রামে ফিরিয়া সে দেখিল, সে যে-স্থান হইতে গিয়াছিল, সে-স্থানে সে আর নাই।

দিদি থাকিতে লোকে এমনভাবে মুখের উপর কথা বলিতে সাহস করে নাই, আজ সকলেই মুখের উপর বেশ দশকথা শুনাইয়া দিল।

মুক্তি-স্নান

সেদিন ঘাটে বোধ হয় তাহার সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছিল, ঘড়াটা লইয়া সৈকত ঘাটে আসিতেই সব চুপচাপ হইয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী সৈকতের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে এলে গা, বউমা ?"

সৈকত উত্তর দিল, "গেল-রাত্রে।"

সত্যভামা মুখ মুচকাইয়া হাসিল, বলিল, "কলকাতায় থেকে বৌদি যেন মেমসাহেব হয়ে গেছে, রং যেন ফেটে পড়ছে!"

নৃপবালা বলিল "অত যত্ন-আদর পেলে সবারই রং ডালিমের মত হয়; তুই-ই গিয়ে থেকে আয়, একমাসে ঠিক অমনি হবি। তারপর হ্যাঁ, ও-কথা যাক,—বউদি নাকি খুব থিয়েটার দেখেছ?" আমার দাদা সেদিন বলছিল—"তুমি নাকি প্রায়ই 'বক্সে' গিয়ে বসতে?"

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী বলিলেন, "সে আবার কাকে বলে মা?"

নৃপবালা বলিল, "সে এক-রকম জায়গা গো, অনেক টাকা দিলে তবে পাওয়া যায়। ব্রজদা বুঝি তোমায় 'বক্স' দিত বউদি?"

একদিন মাত্র 'বক্সে' বসা...সে ব্যাপারটাও লোকের চোখে পড়িয়া গেছে! সৈকতের হাসি আসিতেছিল।

শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "হ্যাঁ, ব্রজ দেবে নাই ছাই! এইতো রঘুনাথের মুখে শুনতে পেলুম সে নাকি কোন্ দেশে চলে গেছে, বলে গেছে আর আসবে না। তাও বলি বাছা, তারও তো ঘেন্নাপিত্তি বলে একটা জিনিস আছে! এই যে সকলের মুখে নিজের বউএর গুণের কথা শোনে, তাতে

কোন্ পুরুষমানুষের মাথা ঠিক থাকতে পারে, বল তো বাছা? তার ওপর আপন চোখে যে ছোটবাবুর সঙ্গে ওকে বেড়াতে দেখেছে। একি সহ্যি হয় বাপু? খুনোখুনি যে করে নি, এই ভালো।"

সৈকতের মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিল।

সত্যভামা সকৌতুকে বলিল, "এখন আর পাড়া-গাঁ ভালো লাগবে কি, বউদি? কবে আবার যাচ্ছো কলকাতায়?"

"দিন এলেই যাব ভাই—"

একপাশ দিয়া নামিয়া ঘড়াটা জলে ভরিয়া লইয়া দৃঢ় পদক্ষেপে সৈকত ঘাট হইতে উঠিল।

এ-অপমান অসহ্য!...

কিন্তু ইহাদেরই বা দোষ কি? মানুষ নিজের ছিদ্রের পানে না তাকাইয়া পরের ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ায়। গ্রামের লোকের জীবন নিতান্তই একঘেয়ে, এই রকমই মাঝে-মাঝে এক-একটা ঘটনা ঘটিয়া তাহাদের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনে, এবং ইহারা ইহাই লইয়া বাঁচিয়া থাকে।

ঘরে ফিরিয়া বারাণ্ডায় ঘড়াটা নামাইয়া রাখিয়া সে ভাবিতে লাগিল।

তাহার রক্ষাকর্ত্তা ভীমও এখানে নাই। আজ এই দুর্দ্দিনে সে কাহার কাছে পরামর্শ লইবে—কে তাহাকে দেখিবে?

দু'দিন থাকিয়াই সৈকত শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

গ্রামের ছেলেরা সুযোগ পাইয়াছিল। তাহারা বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল—গান গাহিতে সুরু করিল, শেষে বাড়ীতে ইট পড়িতে আরম্ভ করিল।

মুক্তি-স্নান

এই সময়ে ভীম কলিকাতা হইতে ফিরিল।

সৈকত তাহার কাছে একেবারে কাঁদিয়া পড়িল—"এখন আমি কি করব, ভীম? আমার কি এখানে থাকা আর হবে না?"

ভীম আস্ফালন করিয়া বলিল, "থাকবে না কেন মা, কে তোমায় এখান হতে তাড়াতে পারে, তাই দেখি। ভীম যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ তোমার কোন ভয় নেই।"

অত্যাচার কম পড়িল কিন্তু আন্দোলন আরও বাড়িল।

গ্রামের ভদ্রলোকেরা একত্র হইয়া ঠিক করিলেন—স্বেচ্ছাচারিণী নারীকে গ্রামে স্থান দেওয়া হইবে না, যেমন করিয়াই হোক ইহাকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

সৈকতের কানেও এ-কথা গিয়া পৌঁছিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেদিন নিজেই আসিয়া বলিলেন, "তোমার তো এখানে থাকা আর চলবে না, বাছা! তুমি হয় তোমার পিসির কাছে নবদ্বীপে, না-হয় কলকাতায় চলে যাও, গাঁয়ে থেকে গাঁ নষ্ট ক'রো না।"

কোনদিনই সৈকত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সামনে বাহির হয় নাই কথা বলা তো দূরের কথা।

আজ সে সহ্য করিতে পারিল না, বলিল, "কেন এখানে আমার থাকা চলবে না, জানতে পারি কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! বলিলেন, "কেন তা-ও

বলতে হবে ? তুমি যা করেছ, তাতে কোনও ভদ্রপল্লীর মধ্যেই তোমার জায়গা হবে না।"

একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সৈকত দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু এ-ও সত্যি কথা—আমি যদি আপনাদের সমাজে না বাস করি, আমি যদি প্রকাশ্যে গণিকাবৃত্তি নিয়ে এখানেই বাস করি, আপনারা কেউই তখন একটা কথাও আমাকে বলতে পারবেন না, সে-অধিকারও আপনাদের থাকবে না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্ফারিত নেত্রে সৈকতের পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

তাহার পরই হঠাৎ বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন, "তুমি এ-কথা বললে,—অ্যাঁ! তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, আমাদের ব্রজেশ্বরের স্ত্রী হয়ে এ-কথা বলতে পারলে ?"

শান্তকণ্ঠে সৈকত বলিল, "হ্যাঁ বলেছি, বলতে আমার মুখে বাধল না—আপনি তাই আশ্চর্য্য হচ্ছেন ? শুনেছি দশচক্রে নাকি ভগবান্‌ও ভূত হয়েছিলেন। আমাকেও আজ আপনাদের চক্রে পড়ে ভূত হতে হয়েছে। কাজেই কোন কথা বলতে আজ আমার মুখে এতটুকু বাধছে না। এখনও আমি আপনাদের সমাজের মধ্যে বাস করছি বলেই না আমার চোখ রাঙিয়ে তাড়িয়ে দিতে এসেছেন, কিন্তু আমি যদি সে-রকম ভাবে বসি, আইনের সাহায্য নিয়েও আমায় তুলতে পারবেন কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি শুনুন, আমি কিছুতেই ঐ-ভিটে ছাড়ব না—আপনার যা খুসি আপনি তাই করুন গিয়ে।"

গর্ব্বিতভাবেই সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

মুক্তি-স্নান

ভট্টাচার্য্য মহাশয় খানিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ফিরিয়া বলিয়া গেলেন—"তোমায় ওঠাতে পারি কি-না দেখে নিয়ো।"

ইহারই কয়েকদিন পরে একদিন গভীর রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সৈকত দেখিতে পাইল—ঘরে আগুন লাগিয়াছে।

দরজা খুলিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

ভীম বারাণ্ডায় পড়িয়া তখনও ঘুমাইতেছিল, সৈকত চীৎকার করিয়া ডাকিল—"শীগ্‌গীর ওঠো ভীম, ঘরে আগুন লেগেছে।"

ভীমের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মুহূর্ত্তমাত্র সে হতবুদ্ধির মত আগুনের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পরই হুঙ্কার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা, আগুন নিবানো গেল না।

জ্যৈষ্ঠ মাস, এখনও বৃষ্টি হয় নাই, চাল শুকাইয়াছিল, তাহার উপর বাতাস বহিতেছিল জোরে—ধূ-ধূ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

পাশাপাশি লোকজন ছুটিয়া আসিল, স্বয়ং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও পুত্রসহ ছুটিয়া আসিলেন, আগুন নিবাইবার জন্য ছুটাছুটিও যথেষ্ট হইল, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না।

ভীম ছুটিতেছিল—সৈকত বাধা দিল। শান্তকণ্ঠে বলিল, "আর নয় ভীম, যা যাচ্ছে তা যেতে দাও, ঘর যখন পুড়েছে, পুড়ে ছাই হোক। আমি বেশ জানছি, আমার এখানকার বাস ফুরিয়েছে, ভাগ্যচক্র আমায় যেদিকে টানছে এখন সেইদিকেই যেতে হবে, চেষ্টা করলেও আমি রক্ষা পাব না।"

হুড়মুড় করিয়া জ্বলন্ত চালা খসিয়া পড়িল, ধূ-ধূ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

হতাশভাবে বসিয়া পড়িয়া ভীম বলিল, "কিছুই বাঁচাতে পারলুম না মা! মিথ্যে আগুন নিবানোর চেষ্টা না করে যদি জিনিষপত্রও বার করবার চেষ্টা করতুম—"

সৈকত মলিন হাসি হাসিল। বলিল, "জিনিষপত্র কি আছে ও-ঘরে? সামান্ত দুই-একখানা ছেঁড়া কাপড়, দুই-একটা ভাঙা ঘটী-বাটি—এ-ছাড়া আর কিছু নেই ভীম।"

ভোরের দিকে আগুন নিবিয়া আসিয়াছিল। গ্রামের লোক তাহার অনেক আগে ঘরে ফিরিয়া গেছে। ভোরের আলো পূব-আকাশ রঙিন করিয়া তুলিতেছিল, পাখীরা তখনও নীড়ের মায়া পরিত্যাগ করে নাই।

একদৃষ্টে দগ্ধ ঘর দু'খানার পানে তাকাইয়া সৈকত ভাবিতেছিল—এখন উপায় কি, সে কোথায় যাইবে—কি করিবে!···

দেশ ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া আসিলেও সেই দেশের দিকেই মন টানে।

ব্রজেশ্বর লেখাপড়া ভালো জানিত না, তথাপি তাহার মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা ছিল, সেইজন্য সে ফিল্মেও একরকম নাম করিয়া ফেলিল।

কিন্তু যাহাকে একদিন সে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছিল, আজও তাহার কথাই বিশেষ করিয়া তাহার মনে পড়ে।

ব্রজেশ্বর যখন বাড়ীর কথা ভাবে, তখন সে অন্যমনস্ক হইয়া যায়।

কলিকাতায় থাকিতে গ্রামের লোকের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হইত, তাহাদের মুখে সে শুনিতে পাইয়াছিল, ছোটবাবু বাড়ীতে তাহার পরিবারবর্গকে নিয়মিত সাহায্য করিতেছেন।

লোক যে-ভাবেই কথাটা বলুক, ব্রজেশ্বর সত্যই তাহাতে দোষের কিছু পায় নাই, বরং ছোটবাবুর দয়ার জন্য সে কৃতজ্ঞই হইয়াছিল। তাহার মনে আশা ছিল, যেদিন সে প্রচুর যশ, মান, অর্থ লাভ করিবে, সেইদিন সে তাহার স্ত্রীকে নিকটে আনিবে, তাহার আগে নয়।

সৈকত যে থিয়েটার দু'চক্ষু দিয়া দেখিতে পারে না, এই ব্যথাটাই তাহার মনে নিরন্তর জাগিত।

কিছুকাল পরে সে শুনিল, সৈকত দিদিকে লইয়া কলিকাতায় ছোট-বাবুর বাড়ীতে আসিয়া আছে।

এ-সম্বন্ধে সে এমন অনেক অতিরঞ্জিত সংবাদ পাইয়াছিল, যাহাতে সত্যই তাহার মনে সন্দেহ জাগিয়া উঠিতে পারে।

ছোটবাবুর সঙ্গে যেদিন দেখা হইল—সেদিন তাঁহাকে সৈকতের কথা জিজ্ঞাসা করিতে তিনি প্রথমটায় হাসিয়া উঠিলেন, তাহার পর জানাইলেন—সে তাঁহার বাড়ীতে নাই।

ছোটবাবুর এই গোপন করার ইচ্ছাটাই ব্রজেশ্বরকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল।

তাহার পর 'বপ্নে' সৈকতকে দেখা···

সে লক্ষ্য করিতেছিল—দিদি মাঝখানে থাকিলেও ছোটবাবু সৈকতের সহিত গল্প করিতেছেন, চা ও পাণ আনিয়া তাহার সামনে ধরিতেছেন।

অভিনয়ে কতবার ভুল হইল—কতবার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল।

তাহার পর···

উঃ, সে যখন দেখিতে পাইল—সৈকত পড়িবার মত হইবামাত্র ছোটবাবু তাহাকে দুই হাতে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, তখন তাহার শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল!

আজ সৈকতের কথা মনে করিতে গেলে সেই দৃশ্যই মনে পড়ে।

কিন্তু দোষ কার? সৈকত যে আজ ছোটবাবুর আশ্রিতা, সে কাহার জন্য,—তাহার জন্যই নয় কি?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সে কিছুতেই চাপিতে পারে না।

একবার দেশে ফিরিবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া উঠে।

সৈকত যেখানে থাকে থাক, সে সৈকতকে দেখিতে চায় না, দেখিতে চায় নিজের ভিটাখানি,—যেখানে তাহার পিতৃপুরুষ শেষ-শয্যা

পাতিয়াছেন।···তাহার জন্মভূমি তাহাকে ডাক দিয়াছে, সে ফিরিবার জন্য প্রতিনিয়তই ছটফট করিতেছিল।

অবশেষে সত্যই একদিন সে বন্ধের নিকট বিদায় লইয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল।

তিন বৎসর পরে ব্রজেশ্বর গ্রামে আসিয়া দাঁড়াইল।

দীর্ঘ পথ সে প্রায় ছুটিয়া আসিয়াছে—পথে যাহার সহিত দেখা হইয়াছে, সেই বিস্মিত হইয়া তাহার পানে তাকাইয়া দেখিয়াছে।

কিন্তু বাড়ী কই—?

সমস্তটাই ভট্টাচার্য্যের বাগান, তাহার বাড়ীর চিহ্নও তো নাই!

স্তম্ভিত হইয়া ব্রজেশ্বর দাঁড়াইল।

এ-যেন আরব্য-উপন্যাসের গল্প। রাতারাতি দৈত্য একটা প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ আনিয়া মাঠের মাঝখানে স্থাপন করিয়া ছিল, আবার একটা রাতেই সে-প্রাসাদ মাথায় করিয়া কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছিল কে জানে!

আরব্য-উপন্যাসের নায়ক সে নয়,—কোনও রাজকন্যাকেও সে বিবাহ করে নাই। তাহার কুঁড়ে-ঘরও দৈত্যের দান ছিল না, তাহার পূর্ব্বপুরুষ এই কুঁড়ে-ঘর দু'খানি বুকের সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা প্রেম ও প্রীতি দিয়া গড়িয়াছিলেন, সে কুঁড়ে-ঘরের চিহ্ন বিলীন করিয়া দিল কে—সে কোন্ দৈত্য—কোন্ পিশাচ? ··বেশ মনে আছে, এই পাশের ধারেই রাংচিতার বেড়া দিয়া ঘেরা ছোট্ট বাগানখানা ছিল, সজিনা গাছ দুইটি

আজও তো সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে! কোন-একদিন ব্রজেশ্বর দূর গ্রাম হইতে একটা স্থলপদ্ম-ফুলের ডাল আনিয়া পুঁতিয়া দিয়াছিল এবং তাহার অশেষ যত্নে সেই ডালটীতেই যখন জীবন-সঞ্চার হইয়াছিল, তখন তাহার আনন্দের শেষ ছিল না। সেই গাছটা আজও তো সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে,—পাতাগুলি দুলাইয়া তাহাকে অভিবাদন করিতেছে!

ব্রজেশ্বরের দুই চোখ একবার জলিয়া উঠিল, পরক্ষণে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

গ্রামে ততক্ষণ প্রচার হইয়া গিয়াছিল—ব্রজেশ্বর আসিয়াছে। বিখ্যাত অভিনেতাকে দেখিবার জন্ত, তাহার সহিত কথা কহিবার জন্ত,—তাহাকে তাহার শোচনীয় অধঃপতনের কথা শুনাইবার জন্ত সকলেই আসিয়া দাঁড়াইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিরিক্ত আদর-যত্ন করিয়া ব্রজেশ্বরকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

ব্রজেশ্বর আপত্তি করিল না,—নীরবেই তাঁহার সঙ্গে গেল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজের বাড়ীতে অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহাকে আহার করাইলেন, বার বার শুনাইলেন, "এ বাবা তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, তোমার যখনই খুসি হবে তুমি এখানে চলে আসবে। তোমার ঘর পুড়ে গিয়েছিল বাবা···কেমন করে যে আগুন লাগল কে জানে! গাঁয়ের লোক সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল যাতে আগুন নিবে যায়, তা সে আগুন কি আর নেবে? বউমাও যে সেইরাত্রে কোথায় গেলেন, আমরা অনেক খোঁজ করেও কোন সন্ধান পেলুম না।"

মুক্তি-স্নান

ব্রজেশ্বর অন্তমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আজও কোন সন্ধান পান নি ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেন অনিচ্ছায় সহিত বলিলেন, "সন্ধান কি আর পাওয়া যায় না, বাবাজি ! এই যে তুমি দেশের এক-খুড়ো—সেই বয়েতে গিয়েছিলে, সে-খবরও কি চাপা ছিল ? এ তো এই কলকাতা, ওখানকার খবর আর এখানে পাওয়া যাবে না ? কিন্তু সে-সব কথা বলার চেয়ে না বলাই ভালো ; তোমার কানে আপনিই আসবে, চাই কি চোখেও দেখতে পাবে।"

ব্রজেশ্বর কথা কহিল না।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "হ্যাঁ, আর এক কথা—তোমার জায়গাটা বড়বাবু দখল করে নিচ্ছিলেন দেখে, আমি ওটা নিজের সীমানার বেড়া দিয়ে রেখেছি। বড়বাবুর কবলে একবার গেলে আর ও-জায়গা পেতে না বাবা, ওরা সব রাঘব-বোয়াল, এতটুকু জিনিস পেলেই টপ্ করে গিলে ফেলবে। আমি জায়গাটা রেখেছি অনেক ভেবে ; জানি তুমি একদিন ফিরে আসবেই, চিরদিনই কিছু বিদেশে কাটাবে না। সংসার আবার নতুন করে পাততে হবে তো, জায়গা থাকলে ঘর তুলবার দেরী হবে না। বল তো আমি কালই মিস্ত্রী-মজুর লাগাই, তুমিও ভালো বংশের সুন্দরী মেয়ে দেখে, বিয়ে করে সংসারী হও।"

ব্রজেশ্বরের মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, "আবার বিয়ে,—কিন্তু পাত্রী কোথায় ? বাংলা দেশে এমন লোকও আছে নাকি যে এই বয়াটে লক্ষ্মীছাড়ার হাতে মেয়ে দেবে ?"

কথাটা যেন লুফিয়া লইয়াই ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "দেবে না আবার ?

তুমি একবার বলতো বাবাজি, মুখের কথা খসাও, দু'হাজার মেয়ে এনে তোমার সামনে দাঁড় করিয়ে দেব। বাংলায় মেয়ের অভাব কে বলে? কত মেয়ে বিয়ের অভাবে, মা-বাপকে সমাজের শাসন হতে রক্ষা করতে গলায় দড়ি দিচ্ছে—জলে ডুবে মরছে সে খবর রাখো? তুমি একটিবার মুখের কথা বল—আমার ভাগ্নি রাণুকে তোমার হাতে সমর্পণ করি।"

ব্রজেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু আমিই যে আর বিয়ে করব না।"

এতখানি হাঁ করিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "সে-ও কি একটা কথা হ'তে পারে বাবাজি? তোমার মত ধাক্কা হয় তো অনেকেই পায়, তাই বলে তারা আর বিয়ে করে না, আর সংসার পাতে না? ও-সব কথা ছেড়ে দাও, ঘর-দোর তৈরী করি, বিয়েটা কর। তারপর তুমি এখানে-সেখানে কাজ করতে যাও, আমরাই রাণুকে দেখব শুনব।"

ব্রজেশ্বর গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "দেখা যাক। ...আপনি যে-সব গাছপালা ওখানে লাগিয়েছেন সে গুলো এ-বছরকার মত উঠে যাক, তারপরে ঘর-তোলা এমন-কিছু কঠিন ব্যাপার হবে না।"

কথাটা উপস্থিত এইখানেই চাপা পড়িয়া গেল।

১০

একদিন নিতান্ত অনাহূতভাবেই ব্রজেশ্বর ছোটবাবুর কলিকাতার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

ছোটবাবু দু'-চার জন বন্ধু সহ বৈঠকখানায় বসিয়া তাস খেলিতে-ছিলেন।

ব্রজেশ্বরকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন।

ব্রজেশ্বর একবার তাঁহার বন্ধুদের পানে তাকাইল, মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, রমেন বাবু।"

ছোটবাবু সত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

হাতের তাস গুটাইয়া রাখিয়া বলিলেন,"ব'সো ব্রজেশ্বর, কথা শুনছি। তোমার চেহারা ভারি খারাপ দেখাচ্ছে, অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি? বম্বে হতে ফিরলে কবে, ওখানকার কাজ ছেড়ে দিলে নাকি?"

ব্রজেশ্বর ফরাসের একপাশে শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া, বলিল, "হ্যাঁ, ওখানকার কাজ ছেড়ে দিয়েছি, এখানেই একটা কোম্পানীতে কাজ পেয়েছি···কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক রমেনবাবু···আমি দেশে গিয়েছিলুম বোধ হয় শুনেছেন?"

ছোটবাবু বন্ধুদের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "আর খেলবো না হে।

এঁর সঙ্গে আমার গোটাকয়েক প্রাইভেট্ কথা আছে, তোমরা এ-ঘরে বসো, আমি একবার ও-ঘরে যাচ্ছি।"

বন্ধুরা বসিলেন না, উঠিয়া পড়িলেন।

সকলেই বিদায় লইয়া গেল, রহিলেন কেবল ছোটবাবু আর ব্রজেশ্বর।

ছোটবাবু বলিলেন, "তুমি যে দেশে গিয়েছিলে সে খবর আমি পাইনি বললে কি বিশ্বাস করবে, ব্রজেশ্বর?"

ব্রজেশ্বর মাথা নাড়িল, "না,—আপনাকে আমি সকলের চেয়ে বেশী চিনি বলেই বিশ্বাস করতে পারব না, রমেন বাবু।"

মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া সে বলিল, "সৈকতকে একবার ডেকে দিন, আমি তার সঙ্গে দুটী-চারটী কথা বলে চলে যাব। আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমি আসিনি।"

ছোটবাবুর মুখখানা মলিন হইয়া গেল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "সৈকত! সে তো আমার এখানে নেই ব্রজেশ্বর!"

ব্রজেশ্বর তীব্রনেত্রে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার অন্তরের পৈশাচিক ভাব তাহার চোখেই ফুটিয়া উঠিল।

তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—দুইহাতে এই নর-পশুটার বুক বিদীর্ণ করিয়া দেয়, চোখ দুইটি নখরাঘাতে উপড়াইয়া ফেলে।

ব্রজেশ্বর রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জিয়া বলিল, "আপনার এখানে নাই বলছেন, কিন্তু আমি জানি সে আপনার এখানেই আছে রমেন বাবু। আপনার ওপরের ঘরে সে আছে। আপনি যদি তাকে না ডেকে দেন, আমি নিজেই তাকে ডাকব।"

দ্রুতপদে সে বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল, দ্বিতলের

দিকে মুখ ফিরাইয়া উন্মত্তের মতই ডাকিতে লাগিল—"সৈকত—সৈকত!"

ছোটবাবু তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া তিরস্কারের সুরে বলিলেন, "পাগল হয়েছ ব্রজ, আমার কথা বিশ্বাস করছো না? আমি তোমায় সব কথা বলছি, তুমি শান্ত হয়ে শুনবে এসো, আমি বেশ বুঝেছি, তুমি এখনও কিছু খাওনি। আগে একটু জল খাও, তারপর আমি তোমায় সব বলব।"

এক রকম প্রায় জোর করিয়াই তিনি তাহাকে ঘরে টানিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার আদেশে ভৃত্য জলখাবার দিয়া গেল।

ছোটবাবু বলিলেন, "জল খেয়ে নাও, ব্রজ।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "না, আগে আপনি বলুন।"

ছোটবাবু রাগ করিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল হয়েছ ব্রজেশ্বর, না হলে সামান্য একটা মেয়ের জন্য এ-রকম করবে কেন? আমাকে এককালে তুমি বিশ্বাস করতে, আজ আমি তোমার সেই বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে বলছি, আমি তোমায় সব বলব, তুমি আগে একটু জল খাও।"

একটা মিষ্টান্নের এককোণ ভাঙ্গিয়া মুখে দিয়া ব্রজেশ্বর এক-নিঃশ্বাসে সব জলটুকু খাইয়া ফেলিল।

ছোটবাবু বলিলেন, "এবার সব বলছি, শোন। তুমি গ্রামে গিয়েছিলে, সেখানেই বোধ হয় শুনেছ সৈকত আমার এখানে আছে।"

তারপর একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "কথাটা কিন্তু একেবারে মিথ্যে। আমি শুনেছি, সৈকতের স্বামীর ভিটে ছেড়ে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, আর এই নিয়ে সে গ্রামের নেতাদের সঙ্গে বেশ একটু ঝগড়াও করেছিল। এরই ফলে তার স্বামীর ভিটে একরাত্রে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—তার দাঁড়াবার জায়গাটুকু ঘুচে যায়! কিন্তু সে আমার

এখানে আসে নি। আমি অনেক পরে যখন খবর পেলুম, সে তখন কোথায় চলে গেছে, কেউ খবর দিতে পারলে না। তোমায় সত্যিকথা বলছি ব্রজেশ্বর, সৈকতকে পাওয়ার আশা আমার ছিল, আর সেইজন্যেই আমি অত খরচও করেছি। সে যখন জোর করে গ্রামে চলে যায়, তখন আমি বার বার তাকে বলে দিয়েছিলুম—যদি সে সেখানে থাকতে না পারে, যেন আমার কাছে আসে। কিন্তু সে আসে নি, একা যে কোথায় চলে গেছে সে-খবর ভীমও জানে না।"

ব্রজেশ্বর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বুঝেছি, সে আত্মহত্যা করেছে।"

একটু হাসি ছোটবাবুর মুখের উপর ভাসিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "না, সে-সাহস তার হয় নি। যদি আত্মহত্যাও সে করত, আমি সত্যিই তাকে অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি দিতুম। সে উপস্থিত এখানেই আছে, ব্রজেশ্বর, আমি তাকে প্রায়ই দেখতে পাই।"

বিস্ফারিত নেত্রে ব্রজেশ্বর বলিল, "এখানে—?"

ছোটবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, এখানেই। তুমিও ইচ্ছা করলে তাকে দেখতে পাবে ব্রজেশ্বর,—সে এখন থিয়েটারের অভিনেত্রী, সে বিখ্যাত 'বকুল'।"

"বকুল—!"

ব্রজেশ্বর একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বকুলের নাম সে অনেকবার শুনিয়াছে; হয় তো ফটোও দেখিয়াছে, কিন্তু তাহা দেখিয়াছে মাত্র। আচমকা একটুখানির জন্য মনে হইয়াছে—ইহার চোখ দুটো অনেকটা সৈকতের মত, ইহার কপাল ও চিবুকের ভাব যেন সৈকতকেই মনে করাইয়া দেয়। তথাপি সে

মুক্তি-স্নান

কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, বাংলার চির-লজ্জাশীলা বধূ সৈকতই আজ 'বকুল' রূপে এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, দেশ-বিদেশে তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে!

ছোটবাবু বলিতে লাগিলেন, "আজ তার নাগাল পাওয়া আমাদের মত লোকের পক্ষে একেবারেই দুষ্কর। একজন প্রসিদ্ধ বড়লোকের আশ্রিতা সে, তার প্রকাণ্ড বড় বাড়ী, দরজায় দ্বারোয়ান। তোমার-আমার মত লোক তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, থিয়েটারে ষ্টেজের উপর তাকে আর-পাঁচজন যে-রকম ভাবে দেখে, তুমিও সেই রকম ভাবে দেখতে পাবে, ব্রজ। অধিকার স্থাপনের চেষ্টা ক'রো না, কারণ সে আজ সৈকত নয়—তোমার স্ত্রী নয়। গত-জীবনের কথা সে ভুলে গেছে। বর্ত্তমান-জীবনে সে বকুল, সে দেশের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী,—এই তার পরিচয়।"

আর্দ্রকণ্ঠে ব্রজেশ্বর বলিল, "গত-জীবনের কথা কেউ-কি কোনদিন ভুলতে পেরেছে, বলুন দেখি? আমাদের চলার পথে ধাক্কা খেয়ে আমরা যখন থমকে দাঁড়াই, তখন সেই পেছনের পানেই দৃষ্টি পড়ে না কি? আপনি অসম্ভব কথা বলছেন, গত-জীবনের কথা কেউ কোনদিন ভুলতে পারে নি, ভুলতে পারবেও না।"

শুধু হাসিয়া ছোটবাবু বলিলেন, "কথাটা ঠিকই বলেছ, কিন্তু বুঝেও ভুল বলছো। চলার পথে ধাক্কা না খেয়ে মানুষ থমকে দাঁড়ায় না, আর না দাঁড়ালেও, পেছনে ফেলে-আসা পথের পানে দৃষ্টি পড়ে না। সৈকতের চলার পথে এখনও বাধা পড়ে নি, বাধা যখন পড়বে, তখন হয়তো পেছন-পানে চাইবে। কিন্তু চেয়ে কেবল তাকে জ্বলেই মরতে হবে। ও-সব কথা

ছেড়ে দাও ব্রজেশ্বর, মনে কর সে নেই—ম'রে গেছে। এই তো কতদিন তাকে ছেড়ে চলেও গিয়েছিলে,—সেই রকম ভাবেই তাকে এড়িয়ে যাও।"

ব্রজেশ্বর একটু হাসিল মাত্র।

সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্ছো?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "দেখি, কোথাও একটা থাকবার জায়গা ঠিক ক'রে নিই গিয়ে।"

ছোটবাবু শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার হাতে যে কিছু নেই, তা বুঝতে পারছি; এ-অবস্থায় থাকার জায়গা পাবে কোথায়?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "দেখি গিয়ে,···সত্যই হাতে কিছু নেই। যা-কিছু পেয়েছিলুম তা—"

সে নীরব হইয়া গেল।

ছোটবাবু বলিলেন, "বুঝেছি, সৈকতের 'পরে রাগ ক'রেই সব উড়িয়ে দিয়েছ। কিন্তু এ-কি পাগলামী তোমার,—একটা মেয়ের জন্যে তুমি এমন ভাবে নিজের জীবনটাকে পর্য্যন্ত খেলার জিনিষ মনে করছ! যাক, তুমি আমার এখানে থাক ব্রজেশ্বর, আমি যে সৈকতের জন্যে একদিন ব্যাকুল হয়ে ছিলুম সে-কথা আজ ভুলে যাও, আমায় ক্ষমা কর।"

ব্রজেশ্বর হাত দু'খানা কপালে ঠেকাইল—রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আপনার দয়ার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু মাপ করবেন, আমি আপনার এ-দয়া নিতে পারলুম না।"

সে বাহির হইয়া গেল।

জানালা-পথে ছোটবাবু দেখিলেন—সে হন হন করিয়া ছুটিতেছে।

সত্যই মানুষ অতীতের স্মৃতি ভোলে না—ভুলিতে পারে না।

বর্ত্তমান হয়তো অনেক-কিছুই নূতন জিনিস লইয়া আসে, সুখ-সম্পদ দান করে, কিন্তু শান্তি তাহাতে মিলে না বলিয়াই তাহার দান ব্যর্থ হইয়া যায়।

সৈকতের আজ অভাব নাই, অর্থ সে প্রচুর পাইয়াছে, নাম-যশও যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু শান্তি কোথায়?

সৈকত পিছনে ফেলিয়া-আসা পথের পানে তাকায়।

মানুষ যে-পথ ধরিয়া চলে, তাহার পানে ফিরিয়া চায়, কিন্তু সে-পথে ফিরিয়া যাইতে সে আর পারে না।

সৈকত আজ সৈকত নয়, বকুল।

এ-নাম যে দিয়াছিল, তাহার কথা আজও সৈকত ভুলিতে পারে নাই। নিদারুণ অভিমান, দুঃখ ও বেদনায় সে তখন অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। যাহাকে সে সমস্ত মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া ভালবাসিয়াছিল, তাহার নিকট বিশ্বাসঘাতিনী হইবার কল্পনা সে কখনও করে নাই, স্বপনেও সে ভাবে নাই—যে-পথ সে চিরদিন ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সেই পথেই তাহাকে আসিতে হইবে।

তাহাকে কেহ স্থান দিল না, কেহ তাহার প্রকৃত দুঃখ কোথায় তাহা

বুঝিল না। সকলেই তাহাকে স্থান দিতে চাহিল পরোক্ষভাবে, এবং বিনিময়ে চাহিল তাহার দেহ।

আজও সৈকতের সে-দিনের কথা মনে পড়ে।

গৃহদাহের পরদিন···সেই অন্ধকারময়ী রজনী, ভীম কোথায় খাজনা আনিতে গিয়াছিল, আকাশে মেঘ, বিদ্যুৎ, ঝড়, বৃষ্টি—সন্ধ্যার মধ্যে সেই দুর্য্যোগে সে আসিতে পারে নাই।

ভীমের ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া ছিল সে একা, সেখান হইতে এক মাইলের মধ্যে লোকালয় ছিল না।

গভীর অন্ধকারে ঝড়-বৃষ্টি-তুফান তুচ্ছ করিয়া যে-তিনটী লোক বারাণ্ডার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল, একবার বিদ্যুৎ চমকাইতেই সৈকত চিনিতে পারিল—তাহারা কে!

হতভাগিনী নারী অনেকবারই চীৎকার করিয়াছিল, দুর্দান্ত নরপশুগুলার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য অনেক চেষ্টাই করিয়াছিল, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়া গেল।

রাত্রি দেড়টার সময় প্রকৃতির ক্রুদ্ধভাব যখন একটু শান্ত হইয়া আসিতেছিল, সেই সময় ভীম ফিরিয়া আসিয়া বারাণ্ডায় মূর্চ্ছিতা সৈকতকে দেখিতে পাইয়াছিল!···

সৈকত···কিন্তু এ সে-সৈকত নয়। দেহ তাহার কলুষিত হইয়া গেছে, সে কলঙ্কিনী হইয়াছে।

মরিবার ইচ্ছা তাহার হইয়াছিল।

কিন্তু না···মরিলেই তো সব ফুরাইয়া যাইবে, প্রতিশোধ লওয়া হইবে না। যে তাহার ইহকাল-পরকালের ভার লইয়াছিল, সে আজ তাহাকে

ছাড়িয়া দূরে সরিয়া গেছে। সৈকত বাঁচিয়া থাকিবে, কেবল সেই ইহ-পরকালের দেবতাকে দেখাইবার জন্তই সে বাঁচিবে, সে মরিবে না।

প্রতিশোধ লইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাহাকে দগ্ধ করিতেছিল, সেই জন্তই সৈকত একদিন সোজা কলিকাতায় রওনা হইল।

প্রথমে সে থিয়েটারে ছোট অংশের ভূমিকা পাইয়াছিল, কিন্তু নিজের চেষ্টায় সে আজ রঙ্গালয়ের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী,—শ্রেষ্ঠা গায়িকা। তাহার অনিন্দ্যরূপে নাট্যমঞ্চ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সে অভিনয় করিতে নামিলে দর্শকেরা আনন্দে চীৎকার করে।

ষ্টেজে নামিয়াই সৈকত একবার প্রতি-দর্শকের মুখের উপর চোখ বুলাইয়া যায়।

যাহার জন্ত সে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহাকেই কৃতিত্ব দেখাইবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিয়া উঠে।

কিছুদিন আগে সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দর্শকের আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া ছিলেন। তিনি গ্রামে থাকিতে কাহার মুখে শুনিতে পাইয়াছিলেন সৈকত অভিনয় করে,—পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া তাহাকে একবার দেখিবার লোভ এই পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধও সামলাইতে পারেন নাই।

থিয়েটার শেষ হইবামাত্র তিনি যে-ঘরে অভিনেত্রীরা পোষাক ছাড়িতেছিল তাহারই দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন, বিনীতভাবে জানাইলেন, তিনি একবার বকুলের সহিত দেখা করিতে চান।

কিন্তু বকুল সেদিন নিজের চাকর দিয়া তাঁহাকে হাঁকাইয়া দিয়াছিল।

মুক্তি-স্নান

বকুলের বাড়ীর দরজায় দ্বারোয়ান। জমিদার হরিপ্রসন্ন রায় ছাড়া সে-বাড়ীর চৌকাঠ পার হইবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই।

বাহিরে সে আজ বকুল সাজিলেও অন্তরের সৈকত মরিয়া যায় নাই। আজিও সে তাহার সেই হতভাগ্য স্বামীর কথা মনে করিয়া সিঁথিতে সিঁদুর দেয়, হাত জোড় করিয়া প্রার্থনা করে—"তাকে বাঁচিয়ে রেখো ঠাকুর, আমার কথা যেন সে একেবারেই ভুলে যায়।"

কাজ করিতে করিতে সে হঠাৎ থামিয়া যায়, অন্যমনস্কভাবে কোনদিকে তাকাইয়া থাকে, মনের মধ্যে বায়স্কোপের ছবির মতই কতকগুলা চলন্ত ছবি জাগিয়া উঠে, আবার মিলাইয়া যায়।

—শান্ত পল্লীর বুকে ক্ষুদ্র কুটীর। তাহার চারিদিকে ঘেরিয়া ছোট্ট বাগানখানি, নিজের হাতে তাহাতে শাক-সবজী রোপণ করিত একটী পল্লী-বধূ,—সে সংসার ছিল তাহার নিজের, তাই সে দুই-এক পয়সা বাঁচাইবার জন্যই প্রাণপাত পরিশ্রম করিত।

—সে ছিল কল্যাণী নারী, সংসারের সব দিকেই তার দৃষ্টি ছিল প্রখর। সে প্রত্যহ ভোরে উঠিয়া ঘর পরিষ্কার করিত, উঠানে গোবর লেপিত, বাসন মাজিত। সকালে-সন্ধ্যায় তুলসী-তলায় প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিত—তাহার সিঁথির সিঁদুর যেন চির-উজ্জ্বল থাকে—হাতের লোহা ক্ষয় না হয়।

—পয়সা জুটিত না, তবু সে একাদশীর দিনে পুষ্করিণীতে ছাঁকা দিয়া অন্ততঃ পক্ষে গোটা-কতক চিংড়ি মাছও ধরিয়া আনিত,—সে শুধু তাহার স্বামীর কল্যাণের জন্য। সে ছিল সৈকত,—সে বকুল ছিল না। সে ছিল আদর্শ গৃহস্থ-বধূ,—বিখ্যাত অভিনেত্রী সে ছিল না।

মুক্তি-স্নান

কত রাত্রি যে বিনিদ্র কাটিয়া যায় তাহা কেহই জানে না। যেদিন হরিবাবু আসেন, বাধ্য হইয়া কান্না চাপিয়া তাহাকে ঘণ্টা দুই-তিনের জন্য অভিনয় করিতে হয়, তাহার পর সারারাত্রি তাহার নিজের।

অসহ্য জ্বালায় চোখে ঘুম আসে না। সে বিছানায় পড়িয়া ছটফট করে, সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে না পারিলে টলিতে টলিতে বাহিরে খোলা ছাদে আসিয়া দাঁড়ায়।

মরিবার ইচ্ছা হয়,—বাক্সের মধ্যে খানিকটা নাইট্রিক অ্যাসিড্, খানিকটা আফিং এখনও পড়িয়া আছে··

বাক্স খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে সেই শিশিগুলা একে-একে সে হাতে তুলিয়া লয়।

জীবন, কতটুকু ? এমন জিনিসও আছে যাহা এতটুকু গলায় ঢালিয়া দিলেই জীবন চলিয়া যায়। সে মরিবে, এ-দুর্ব্বিষহ জীবনের বোঝা টানিয়া বড় বেশীদিন বেড়াইতে পারিবে না। কিন্তু তাহার আগে একবার স্বামীর সহিত দেখা করা চাই—মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার দেখা পাওয়া চাই।

একবার সে জানাইয়া দিবে—সেও অভিনয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সে-ও গান গাহিতে পারে। সে-ও দেখাইতে চায় তাহার রূপ আছে, সে-রূপ দেখিয়া সকলে পাগল হয়।

কিন্তু কোথায় সে ?

একে-একে দিন যায়, মাস যায়, বৎসর চলিয়া যায় ; বোঝা দিন-দিন বাড়িয়াই উঠে, সে তো কই আসে না।

যখন সকলে ঘুমায়, সৈকত একা চুপ করিয়া দূর আকাশের পানে তাকাইয়া ছাদের উপর বসিয়া থাকে, কাহাকে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ

মুক্তি-স্নান

আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠে—"ওগো আর কতদিন—আর কতদিন"—কিন্তু এ-প্রশ্নের উত্তর কে দিবে ?

নৈশ বাতাস তাহার কানের কাছে কাঁদিয়া যায়, আকাশের তারা নির্ব্বাকে তাকাইয়া থাকে।

দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া সৈকত মাটিতে লুটাইয়া পড়ে, আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া ডাকে—"ওগো, আর কবে আসবে, এখনও কি আসার সময় হয় নি,—আজও হয় নি ?"

মানুষ ভালবাসে একবারই একজনকে,—তাহাকেই প্রেম বলা যায়। এ-প্রেমের বিনাশ নাই, এই প্রেমই মানুষকে অমর করিয়া রাখে,—চলার পথে অনেকেই সামনে আসিয়া পড়ে, আবার সরিয়াও যায়,—প্রেমের অম্লান আলো উজ্জ্বলভাবেই চিরকাল জ্বলিতে থাকে।

নারীর অন্তরের বাণী কাহারও কানে পৌছায় নাই। বাহিরে সে শান্ত, সংযত, হাস্যমুখী। তাহার বুকের মধ্যে যে প্রতিনিয়ত কান্নার ঢেউ উচ্ছ্বসিয়া চলিয়াছে, সে-বার্ত্তা কেহ পায় নাই।

১২

সেদিন 'সাবিত্রী' অভিনয় ··

আজ সাবিত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হইবে বিখ্যাত অভিনেত্রী বকুল।

একমাস সে অভিনয়ে যোগ দেয় নাই, গত শনিবারে সে নামিবে এই কথা শুনিয়া অনেক লোকই টিকিট কিনিয়াছিল, ব্রজেশ্বরও ছিল তাহাদের মধ্যে একজন। কিন্তু সে-শনিবারে বকুল নামে নাই, শুনা গিয়াছিল সে তখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই।

কিন্তু এ-শনিবারে বড় বড় অক্ষরযুক্ত হ্যাণ্ড্‌বিলে বকুলের নাম প্রকাশিত হইয়াছে।

আজও ব্রজেশ্বর টিকিট কিনিল।

বড় কষ্টে তাহার দিন কাটিতেছিল। সে পূর্ব্বে যে-থিয়েটারে কাজ করিত, সে-থিয়েটারের অবস্থা আজকাল বড় খারাপ। ম্যানেজার মণিবাবু ব্রজেশ্বরকে দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইলেন এবং পুনরায় তাহাকে থিয়েটারে আসিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন।

বিনীত হাসি হাসিয়া ব্রজেশ্বর হাত দু'খানা জোড় করিয়া বলিল, "মাপ করবেন, থিয়েটার আর করব না, প্রতিজ্ঞা করেছি। এই থিয়েটারের নেশায় প'ড়ে সব ঘুচিয়েছি, নিজের বলতে আর কিছু নেই। আমায় মাপ করবেন মণিবাবু, আমি অভিনয় জীবনে আর করব না।"

মুক্তি-স্নান

মণিবাবু অনেক প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু ব্রজেশ্বর অচল অটল, তাহার সঙ্কল্প হইতে সে বিচ্যুত হইল না।

মণিবাবু বলিলেন, "তোমার ভালোর জন্যেই বলছিলুম, ব্রজেশ্বর। লেখাপড়া এমন-কিছু জান না, যাতে কোথাও চাকরী ক'রে খেতে পারবে। তা ছাড়া—তোমাব এদিকে যে প্রতিভা ছিল, তাতে তুমি দেশ জুড়ে একটা নাম করতে পারতে। তুমি যদি এতদিন আমাদের থিয়েটার ছেড়ে ফিল্‌মে না ঢুকতে—দেশ না ছাড়তে, তা হলে ও থিয়েটারের এত নাম হ'ত না, বকুলের নামও কেউ শুনতে পেত না।"

দপ্‌ করিয়া মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ব্রজেশ্বর মুখ ফিরাইল।

মণিবাবু বলিয়া চলিলেন, "যাই বল—মেয়েটার শক্তি আছে। শুনেছি সে নাকি কোন পল্লীগ্রামে ছিল, ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী। মাত্র কয়টা বছব এখানে এসেছে, এব মধ্যে নামও করেছে তেমনি। ভদ্রলোকের মেয়েরা যে এত ষ্টেজ-ফ্রী হ'তে পারে পাবলিকের মধ্যে এসে, এ-ধারণা আমার আগে কোনদিন ছিল না। গানও গায় তেমনি—লোকে যে কোকিল-কণ্ঠী বলে, সে-বড় মিছে কথা নয়।"

ব্রজেশ্বর আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না, সে বিদায় চাহিল।

মণিবাবু দশটা টাকা তাহাকে দিয়া বলিলেন, "এই টাকাটা নাও, আর বেশ ক'রে ভেবে দেখো,—যদি আসতে ইচ্ছা হয় এসো, অবশ্য আমি তোমায় জোর ক'রে বলতে চাই নে।"

সেই দশটা টাকাতেই কোনক্রমে দিন কাটিতেছে। ব্রজেশ্বর কোন-কোনদিন একবেলা হোটেলে খায়, কোনদিন মুড়ি-মুড়কি খাইয়া দিন কাটাইয়া দেয়।

সেই টাকা হইতেই সে টিকিট কিনিল।

সেদিন থিয়েটার-ঘর লোকে পূর্ণ হইয়া গেছে, একটা সিট্‌ও খালি নাই, অনেক লোক স্থান না পাইয়া ফিরিয়া গেছে।

ব্রজেশ্বরের সিট্ পড়িয়াছিল ঠিক মাঝখানে।

এক বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত ছিল—সে এখান হইতে সৈকতকে বেশ দেখিতে পাইবে, কিন্তু সৈকত তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে না।

কয়েকটা বৎসর আগেকার কথা দপ্ করিয়া মনে জাগিয়া উঠিল।

এমনই একটা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতারূপে অভিনয় করিতেছিল সে, উপরে 'বক্সে' বসিয়া অভিনয় দেখিতেছিল সৈকত; মুগ্ধনেত্রে সে পট-প্রক্ষেপণ দেখিতেছিল,—অভিনয় দেখিতেছিল।

সেইদিন তাহার মনে এই অভিনয়-অনুরক্তি আনিয়া দিয়াছিল কে—ব্রজেশ্বরই নয় কি? এ-পথ তাহাকে দেখাইল কে, শান্ত গৃহনীড় হইতে ভীরু পক্ষিণীকে বাহিরে আনিয়া অসীম আকাশে উড়িতে শিখাইল কে?—

কিন্তু বৃথাই অনুশোচনা—আজ আর কোন পথ নাই, সব পথই রুদ্ধ ইয়া গেছে।

কনসার্ট বাজিল, আবার কখন থামিয়াও গেল। যবনিকা সরিয়া তাহার পরই ভাসিয়া উঠিল—সাবিত্রীর সুন্দর মূর্ত্তিখানি।

দর্শকেরা আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল, সাবিত্রী মৃদু হাসিয়া দের অভিবাদন জানাইল।

এই সাবিত্রী—এই সেই সৈকত! হ্যাঁ, সেই সৈকত। সেই মুখ—সেই , সেই আজানুলম্বিত কেশপাশ, সেই গর্ব্বিত অঙ্গভঙ্গি, পদক্ষেপ—কিন্তু তবু এ সে নয়।

ব্রজেশ্বর নিস্পলকে কেবল তাকাইয়া রহিল।

অভিনয় সে দেখে নাই, সে দেখিতেছিল সৈকতকে—কেবল সৈকতকেই।

হঠাৎ এক সময় চমক ভাজিয়া গেল—

মৃত সত্যবান পড়িয়া, তাহার মাথা কোলে করিয়া সাবিত্রী বসিয়া আছে; একটা গান গাহিতে গাহিতে ঝর ঝর করিয়া তাহার চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছে।

এ-তো মিথ্যা চোখের জল নয়, এ-তো সত্যকার অভিনয় নয়!

সত্যই সে তাহার প্রিয়তমকে হারাইয়া ফেলিয়াছে যে! জীবনে সে তো তাহাকে ফিরিয়া পাইবে না! এ-বেদনা সে জানাইবে কাহাকে? অভিনয়ের সত্যবান আবার বাঁচিবে, আবার স্ত্রীর সহিত মিলন হইবে, কিন্তু সে যে সত্যকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাকে তো আর ফিরিয়া পাইবে না।

দর্শকেরাও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধ ও মহিলারা চোখের জল ফেলিতেছিলেন।

ব্রজেশ্বর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

সকলের দৃষ্টিই তাহার উপর পড়িল। পাশের ভদ্রলোকটী সবি-জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মশাই, উঠলেন যে?"

ব্রজেশ্বর শুধু হাসিয়া বলিল, আর না মশাই, দেখা শেষ হয়ে এবার চললুম।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "সেকি! সত্যবানের মরণ দেখলেন, বাঁচা দেখবেন না?"

মুক্তি-স্নান

"নাঃ," বলিয়া ফিরিতে গিয়াই ব্রজেশ্বরের চোখ পড়িল সাবিত্রীর উপর। সে বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া আছে!

এমন ভাবে দেখার আশা সে করে নাই। এ-যেন স্বপ্নেরও অগোচর।

নীরবেই তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল,—দর্শকবৃন্দ একেবারে শোকে-দুঃখে অধীর হইয়া উঠিল।

একটিবার মাত্র তাহার পানে তাকাইয়া ব্রজেশ্বর বাহির হইয়া পড়িল।

তাহার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতেছিল, সে রঙ্গালয় হইতে বাহির হইয়া অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইল।

তাহার অন্তরের মধ্যে জাগিতেছিল,—সৈকতের এখনকার এই মূর্ত্তি,—পূর্ব্বের সে-সৈকতকে সে আর মনে করিতে পারিতেছে না।

পথের বাঁক ঘুরিতে আনমনা ব্রজেশ্বর একটা লোকের উপর আসিয়া পড়িল—

"কে রে,—" বলিয়া লোকটা পিছন ফিরিল, দারুণ ক্রুদ্ধভাবেই বলিল, "অন্ধ নাকি? পথে চলছো···লোক—"

বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল, মুখের পানে ভাল করিয়া তাকাইয়া বলিল, "কে···ব্রজেশ্বর না?"

গ্রামের রঘুনাথ দা।

ব্রজেশ্বর একেবারে মরমে মরিয়া গেল,—আস্তে আস্তে সে পিছনের গলিটায় ঢুকিয়া পড়িবার সঙ্কল্প করিয়া সরিতেছিল, রঘুনাথ তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

মুক্তি-স্নান

"কি রকম...সরে পড়ছো কোথায়? অনেককাল পরে দেখা হ'ল এখনই যেতে দিচ্ছি নে। এসো এই সামনের পার্কটায় ব'সে দুটো গল্প করা যাক।"

রঘুনাথ ব্রজেশ্বরের হাত ধরিয়া পার্কে ঢুকিয়া পড়িল। একখানা বেঞ্চে তাহাকে বসাইয়া নিজে তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "কি রকম চলছে আজকাল, কাজ-কর্ম্ম কিছুই তো করছো না দেখছি।"

ক্ষীণকণ্ঠে ব্রজেশ্বর বলিল, "নাঃ, বিদ্যে তো নেই, যার বলে চাকরী করব। চাকরী করা মানে এখন কুলি-মজুরের কাজ করা, তা ছাড়া আর উপায় কই?"

রঘুনাথ বলিল, "থিয়েটারে আর যাবে না?"

ব্রজেশ্বর মাথা নাড়িল,—"না—"

রঘুনাথ একটু ভাবিয়া বলিল, "একটা কাজ করলে তোমার সব দুঃখ ঘুচে যায় ব্রজেশ্বর, কুলি-মজুরের কাজও তোমায় করতে হয় না।"

ব্যগ্র হইয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "কি কাজ বল দেখি? যে-কোন কাজই হোক না, পেটের দায়ে আমি এখন সব করতে রাজি—কেবল ওই থিয়েটারে যাওয়া ছাড়া।"

রঘুনাথ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি তোমার স্ত্রীর কথা বলছি।"

ব্রজেশ্বরের মাথায় আবার আগুন জলিয়া উঠিল! তবুও সে শান্তকণ্ঠে বলিল, "কি কথা বল?"

রঘুনাথ বলিল, "অবশ্য এতে রাগ বা দুঃখ ক'রো না, আমার কথাটা আগে কান পেতে শোন। বকুল এককালে তোমার স্ত্রী ছিল। একদিন নয়, দুদিন নয়, পাঁচ বছর তোমারই ঘরে সে ছিল। তুমি যদি ঘর

ছেড়ে না যেতে, হয়তো সে-ও আজ বার হ'তো না। আমি জানি অনেক অত্যাচার-নির্য্যাতনের ফলেই সে চ'লে এসেছে। আজ যদি তুমি একবার তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পার—"

ব্রজেশ্বর আর সহ্য করিতে পারিল না, গর্জ্জিয়া উঠিল, "রঘুনাথ দা—"

রঘুনাথ থতমত খাইয়া গেল।

বলিল, "অবশ্য সেটা তোমার ইচ্ছে, তবে তুমি যদি একবার তার কাছে যাও, আমার মনে হয় সে তোমায় সাহায্য করবে। আজকাল তার তো অর্থের অভাব নেই ব্রজেশ্বর, রাণীর ঐশ্বর্য্য সে পেয়েছে। শুনেছি এককালে সে নাকি ভালও বাসত—"

ব্রজেশ্বর হাসিতে গেল, হাসি ফুটিল না, মুখটাই বিকৃত হইয়া উঠিল।

বলিল, "সে-সব মিছে রঘুনাথ দা, একদিন আমিও এ-ভুল করেছিলুম, ভুল ভেঙে গেছে। আজ যদি কুলির কাজ ক'রে আমায় খেতে হয় সেও আমার অপমান নয়, তবু গণিকার অর্থ আমায় যেন ছুঁতে না হয়। আমি না খেয়ে শুকিয়ে মরব সেও আমার ভাল, তবু তার কাছে প্রার্থী হ'য়ে কোনদিন দাঁড়াবো না।"

নিস্তব্ধ হইয়া সে নক্ষত্রোজ্জ্বল আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল, রঘুনাথও নীরব রহিল।

পাশের বেঞ্চে বসিয়া একটা ছেলে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছিল—

পথের পথিক করেছ আমারে
সেই ভালো ওগো সেই ভালো,
আলেয়া জ্বালিলে প্রান্তর মাঝে,
সেই ভালো ওগো সেই আলো।

১৩

খ্যাতি দুদিনের তরে আসিয়াছিল, আজ তাহা মুছিয়া গেছে।

যাক—তাহাতে দুঃখ নাই, অভিজ্ঞতা যথেষ্টই লাভ হইয়াছে, ব্রজেশ্বর মানুষ চিনিতে শিখিয়াছে। অভিনয়ের উপর তাহার একদিন যতটা আসক্তি ছিল, আজ ততটাই বিরাগ চাপিয়াছে।

একবার শৈল বৈষ্ণবীর খোঁজ করিল, শুনিল সে কোথায় চলিয়া গেছে, কেহ তাহার সন্ধান জানে না।

হাতের টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছে, সে অবশেষে সত্যই একখানা খোলার-ঘরে আশ্রয় লইল।

চেষ্টা করিয়া একটা কাজও পাইয়া গেল,—বেতন মাত্র পনের টাকা। কাজ হইল মোটরে তৈলের ওজন মাপ করিয়া দেওয়া।

মন্দ কাজ নয়।

পথের ধারেই দোকান—সেখানে বসিয়া থাকিতে হয়, কোন মোটরের পেট্রল ফুরাইয়া গেলে দিতে হয় এবং হিসাব করিয়া মূল্য লইতে হয়।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

খানিক আগে বেশ এক-পসলা বৃষ্টি হইয়া গেছে। কিন্তু আকাশের মেঘ তখনও কাটে নাই, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ডাকিতেছিল।

মুক্তি-স্নান

মোটর থামিতেই ড্রাইভার নামিয়া পড়িল, ভিতর হইতে জড়িত কণ্ঠে বাবু বলিলেন, "শীগ্‌গীর করে তেল নিয়ে নাও রাম সিং, আবার বৃষ্টি আসছে।"

ব্রজেশ্বর আগাইয়া আসিল।

হিসাব করিয়া তৈল দিয়া সে মূল্য চাহিল।

ভিতরে যে নারীটি বসিয়া ছিল—পথের আলো বাঁকাভাবে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই মুখের পানে তাকাইয়া ব্রজেশ্বর একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ড্রাইভার মূল্য লইয়া যাইতে বলিল, বাবু গরম হইয়া মুখ বাড়াইলেন, গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দাম নিয়ে যাওনা হে, তোমার জন্যে আমরা কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব?"

মেয়েটী কোমল কণ্ঠে বলিল, "আঃ, যার-তার সঙ্গে ও-রকম ভাবে কথা বল কেন? একটু নরম হয়ে কথা বলবে—"

বাবুটী একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ওর ওপর হঠাৎ এত দরদ কেন বকুল, ওর ফুটফুটে চেহারাটা দেখে বুঝি? হায়রে, হাজার হাজার টাকা ঢেলে আমি মন পাইনে, আর ও-বেটা দোকানের চাকর হয়ে—"

মেয়েটী রাগ করিয়া বলিল, "চুপ।...কাকে যে কি বলতে হয় সে-জ্ঞান তোমার যদি থাকত, তবে সত্যই তুমি মানুষ হয়ে যেতে।"

মুখ বাড়াইয়া সে ডাকিল, "তুমি এদিকে এসো, তোমার দাম নিয়ে যাও।"

ড্রাইভার শশব্যস্তে বলিল, "আমিই দাম দিচ্ছি, আপনি কেন দেবেন?"

মেয়েটী ব্যাগ খুলিয়া হাতের মধ্যে কি উঠাইয়া ব্রজেশ্বরের হাতের মধ্যে তাহা গুঁজিয়া দিয়া আদেশ দিল, "ষ্টার্ট দাও রাম সিং!"

স্তম্ভিত ব্রজেশ্বরের সুমুখ দিয়া মোটর ছুটিয়া গেল।

ব্রজেশ্বর হতবুদ্ধি হইয়া সেই চলন্ত মোটরখানার দিকেই একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তারপর হাতখানা মেলিয়াই ওর দুটি চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

দেখিতে পাইল একখানা নোট, উজ্জল আলোকে দেখা গেল—লেখা আছে 'একশত টাকা!'

ব্রজেশ্বরের চোখে যেন পলক পড়ে না। কতক্ষণ পরে আস্তে আস্তে তাহার আত্মজ্ঞান ফিরিল।

আজ আচম্বিতে কাহার দান লইল সে,—সে তাহার কে?

ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে একদিন রঘুনাথকে বলিয়াছিল—সে গণিকার অর্থ স্পর্শ করিবে না, আজ সেই অর্থই তাহাকে হাত পাতিয়া লইতে হইল!

না, কিছুতেই এ-টাকা সে লইবে না, যেমন করিয়াই হোক ফিরাইয়া দিবে। জানাইয়া দিবে—সে তাহার কেহ নয়, তাহার সংস্পর্শে আসিতে সে ঘৃণা বোধ করে।

পরদিনই সে থিয়েটারে খোঁজ লইতে গেল।

কিন্তু শুনিতে পাইল, বকুল অভিনয় করা ছাড়িয়া দিয়াছে, থিয়েটারে সে আর আসিবে না।

মুক্তি-স্নান

ব্রজেশ্বর তাহার বাড়ীর ঠিকানা চাহিল।

ঠিকানা মিলিল না; ব্যর্থমনে সে ফিরিয়া আসিল।

একশত টাকার নোটখানা তাহার বুকে দারুণ জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল, কোনক্রমে এখানা ফিরাইয়া দিতে পারিলে সে বাঁচে।

সেই সময় মনে পড়িল রঘুনাথের কথা।

সে সৈকতের বাড়ীর ঠিকানা জানে, তাহার কাছে এ-টাকা দিলে সে সৈকতের কাছে পৌছাইয়া দিতে পারে।

সে-দিন সে খোঁজ করিয়া রঘুনাথকে ধরিল।

তাহাকে দেখিয়া রঘুনাথ বলিল, "একি, আজ যে মেঘ না চাইতেই জল! আমিই তোমার কাছে যাব ভেবেছিলুম।

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল দেখি?"

রঘুনাথ বলিল, "তোমার একটা কাজের ঠিক করেছি,—বেশী খাটুনি নেই,—অথচ মাইনে পাবে মাসে চল্লিশ টাকা।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "কোথায়?"

রঘুনাথ বলিল, "একটু অসুবিধা হবে, কারণ কাজটা এখানে নয়, বরানগরে। একজন বড় লোকের সেখানে বাগান-বাড়ী আছে, সেখানে মিস্ত্রী খাটছে, তাদের কাজ দেখতে-শুনতে হবে এই মাত্র। তোমার একটু যা অসুবিধা—কলকাতায় নয়।"

ব্রজেশ্বর খুসি হইয়া বলিল, "আমি কলকাতার বাইরেই যেতে চাই, এখানে থাকতে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। তুমি ওখানেই আমার কাজের ঠিক করে ফেল, আমায় যে-মুহূর্ত্তে খবর দেবে আমি সেই মুহূর্ত্তেই সেখানে চলে যাব।"

তারপর একটু থামিয়া বলিল, "একটা দরকারে এসেছিলাম, যদি একটা কাজ করে দাও—"

রঘুনাথ বলিল, "বল কি কাজ?"

পকেট হইতে সেই নোটখানা বাহির করিয়া রঘুনাথের সামনে ধরিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "এখানা তোমায় ফেরৎ দিয়ে আসতে হবে।"

রঘুনাথ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এ-যে একশ' টাকার নোট দেখছি! কোথায়—কাকে দিয়ে আসতে হবে বল দেখি?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "দিতে হবে বকুলকে।"

"বকুলকে!"

রঘুনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িল।

জড়তা দূর করিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "হ্যাঁ, তাকেই দিয়ে আসতে হবে। জেনো—আমার অনিচ্ছাতে কোন রকমে এ-টাকাটা আমার হাতে এসে পড়েছে। আমি প্রথমে জানতে পারি নি, পরে, দেখে পর্য্যন্ত এখানা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্তে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। থিয়েটারে খোঁজ নিয়ে জানলুম, সে কাজ ছেড়ে দিয়েছে, কাজেই তোমার সাহায্য না নেওয়া ছাড়া আর উপায় খুঁজে পেলুম না। যেমন করেই হোক এ-টাকা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে, আর তাকে জানিয়ে দিতে হবে—সে যেন এ-রকম ভাবে আমার টাকা দিয়ে আর অপমান না করে।"

রঘুনাথ নোটখানা পকেটে ফেলিয়া বলিল, "বেশ, তাই আমি করব, কিন্তু টাকাটা যখন হাতেই পেলে, ফিরিয়ে দিচ্ছো কেন? তোমার অভাব যথেষ্ট, এতে অনেক উপকার হতো।"

ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে ব্রজেশ্বর বলিল, "আগেই তো বলেছি—গণিকার টাকা আমি নেব না।"

সে বিদায় লইল।

চলিতে চলিতে ফিরিয়া বলিল, "যত শীগগীর পারো টাকাটা দিয়ে বলে এলো। আর আমার কাজটা দেখো, আজই যদি হয় আমি কাল করতে চাইনে। যত শীগগীর এখান হতে সরে যেতে পারি ততই আমার ভালো।"

রঘুনাথ বলিল, "সে-জন্য তোমায় ভাবতে হবে না, আমি আজই কথাবার্তা ঠিক করে আসব এখন।"

নিশ্চিন্ত মনে ব্রজেশ্বর চলিয়া গেল।

সমস্ত পথটা সৈকত চুপ করিয়া মোটরের একপাশে বসিয়া রহিল।

হরিপ্রসন্নবাবু অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেছিলেন, প্রথমে তাঁহার খেয়ালই হয় নাই সৈকত সাড়া দিতেছে না,—সে আড়ষ্ট ভাবে একপাশে বসিয়া আছে।

হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—তিনি একাই বকিয়া যাইতেছেন, ও-তরফ হইতে একটি শব্দও শুনা যায় না।

থামিয়া গিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি সৈকতের মুখখানা দেখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রায়ান্ধকার হুডের তলায় মুখ দেখা গেল না। একটু রাগ করিয়াই তিনি বলিলেন, "হঠাৎ এ-রকম চুপ হয়ে যাওয়ার মানে তো আমি কিছু বুঝছিনে বকুল, তোমার কি হল বল দেখি ?"

সৈকত চমকাইয়া উঠিল, হরিপ্রসন্নবাবুর দৃষ্টি যে তাহার উপর পড়িয়াছে ইহা বুঝিয়া সে সতর্ক হইল।

বলিল, "কিছুই হয়নি তো, একটা উপায় ভাবছিলুম।"

ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে হরিপ্রসন্নবাবু বলিলেন, "সেই রাস্কেলটার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ?"

দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া তীব্র কণ্ঠে সৈকত বলিল, "চুপ ! যদি মানুষ

হতে—যদি তোমার বোধ-শক্তি থাকত—অনেক কিছুই আজ বুঝতে পারতে। ফের যদি ও-রকম অসভ্যতা প্রকাশ কর, আমি এখানেই নেমে পড়ব বলে দিচ্ছি।"

হরিপ্রসন্নবাবু চুপ করিয়া গেলেন, বকুলকে চিনিতে তাঁহার বাকি ছিল না।

বৃহৎ অট্টালিকার গাড়ী-বারাণ্ডার নীচে মোটর থামিল। সৈকত নিজের হাতে দরজা খুলিয়া আগেই নামিয়া পড়িল, পিছনের পানে না চাহিয়া সে বরাবর সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল, হরিপ্রসন্নবাবুর পানে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

ভৃত্যদের সহায়তায় কোন ক্রমে হরিপ্রসন্নবাবু যখন উপরে উঠিলেন, তখন সৈকত একখানা সোফায় অলস ভাবে পড়িয়া ছিল, বেড়াইবার পোষাকও তাহার ছাড়া হয় নাই।

শান্তভাবে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হরিপ্রসন্নবাবু বলিলেন, "বেশ আক্কেল তো তোমার, মানুষটা যে পেছনে পড়ে রইল, সেটা একটু খেয়ালে এলো না!"

সৈকত মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আজ তোমার এখানে আসবার তো কথা নেই। কথা ছিল—আমায় পৌঁছে দিয়ে তুমি বাড়ী চলে যাবে,—তোমার স্ত্রী আমায় সে-কথা বলে পাঠিয়েছেন।"

হরিপ্রসন্নবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন, "সে বলে পাঠাবে, আর তার হুকুম আমায় শুনে চলতে হবে, এমন কোনও আইন নেই।"

শান্ত কণ্ঠে সৈকত বলিল, "নিশ্চয়ই আছে। তুমি স্বামী—তোমার স্ত্রীর পরে তোমার যেমন অধিকার আছে, সে স্ত্রী-স্থলেও তোমার পরে তার সেই রকম অধিকার আছে। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার কেউ কোনদিন বিলুপ্ত করতে পারেনি, পারবেও না—তা জানো?"

হরিপ্রসন্নবাবু থতমত খাইয়া গেলেন, মুহূর্ত্ত মাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তোমার মুখে আজ জ্ঞানীর কথা শুনে সত্যিই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি বকুল। দিন দিন কেন তুমি বদলে যাচ্ছো, বিশেষ সেই 'সাবিত্রী' প্লে-র দিন হতে তুমি যেন কি-রকম হয়ে গেছ।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সৈকত বলিল, "সে-দিন হতে বুঝতে শিখেছি, স্বামী আর স্ত্রীর মাঝখানে আর কেউ দাঁড়াতে পারে না, যম পর্য্যন্ত সেখানে হস্তক্ষেপ করতে ভয় পায়।"

হরিপ্রসন্নবাবু বলিলেন, "বাজে কথা থাক, আমি আজ বাড়ী যাব না, এখানেই থাকব। খাওয়া দাওয়ার আয়োজন এখানেই হবে, বুঝলে?"

মাথা নাড়িয়া দৃঢ়কণ্ঠে সৈকত বলিল, "সে কিছুতেই হবে না, আমার আমার একটা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে দাও, অন্ততঃ একজনের কাছেও আমার মুখটা রাখতে দাও। আমি তাঁকে বলে পাঠিয়েছি—আমি আজ তোমায় পাঠাবই। তাঁর ব্রত আজ শেষ হয়েছে, তোমার পা পূজো করে তবে জল খাবেন। এমন মানুষ তুমি—সাধ্বী স্ত্রীর সে পূজো—"

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া হরিপ্রসন্নবাবু বলিলেন, "রাখো তোমার পা-পূজো, সব-তাতেই বাহাদুরী। আজ-কালকার দিনে কেউ আবার স্বামীর পা-পূজো করে—তাও আবার দশজনকে জানিয়ে? ছেড়ে দাও বকুল—ও-সব ছাড়ো। না-হয় সে আজ-রাত্রিটাও জল খাবে না,

সকালে যখন বাড়ী ফিরবো তখন পা পুজো করে জল খাবে, তা হলেই হল।"

সৈকত ঘৃণাপূর্ণ নেত্রে এই লোকটার পানে তাকাইয়া রহিল।

পূর্ব্ববৎ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "আমি আজ তোমায় কিছুতেই এখানে থাকতে দেব না, তোমায় জোর করে পাঠাবই। ওঠো বলছি, ইহকাল তো গেছেই, পরকালের একটু ভাবনা ভাব—বাড়ী যাও।"

ব্যঙ্গের স্বরে হরিপ্রসন্নবাবু বলিলেন, "আজ-কাল পরকালের ভাবনাও ভাব নাকি বকুল? চমৎকার!…ইহকাল আমার ব্যর্থ হলেও পরকাল আমার থাকবে জানি,—আমার স্ত্রীর পুণ্যে হয় তো আমি ত'রে যাব, কিন্তু তুমি—তোমার যে পরকালও নেই। ইহকালেই যা কুড়াতে পার কুড়িয়ে নাও। বাবা, তোমার মুখে সাধু-কথা শুনলে সত্যি গায়ে যেন জ্বর আসে! মনে হয় কালে কালে আরও কতই হবে—হয় তো কোনদিন গলায় তুলসীর মালা পরে মাধুকরী-বৃত্তি নিয়ে বৃন্দাবনের পথে ছুটবে! অসম্ভব নয়। যাক, আমি এই চললুম, পারি তো কাল আবার আসবো।"

টলিতে টলিতে তিনি উঠিলেন।

পলকহীন নেত্রে সৈকত তাকাইয়া রহিল।

হরিপ্রসন্নবাবুর কথাগুলা তাঁহার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

সত্যই তাঁহার ইহকাল নাই—কিন্তু পরকাল আছে। আর কেহ না বিশ্বাস করুক—তিনি বিশ্বাস করেন তাঁহার স্ত্রীর পুণ্যে তিনি রক্ষা পাইবেন।

আর সে?

তাহার কিছু নাই। ইহকালের খেলা-ধূলাই সে করিবে, সংসারের কাদামাটিই মাখিবে, পরকাল বলিয়া তাহার কিছু নাই। সে নিজের হাতে সব নষ্ট করিয়াছে—যথাসর্ব্বস্ব ঘুচাইয়াছে।

নিজের হাতে?

সেই রাত্রিটার কথা মনে পড়ে—এমনই একটা মেঘান্ধকারে ঢাকা রাত্রি,—ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত···সেই বারাণ্ডায় ছিল সে...

অপরাধ কাহার—তাহার কি?

গ্রামে আর সে থাকে নাই, যাহারা তাহাকে সরাইয়া দিয়াছে, তাহাদেরই দ্বারে সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়া যায় নাই।

সে আত্মহত্যা করিতে পারে নাই, তাহার মনে কামনা জাগিয়াছিল—সে আর-একবার তাহার স্বামীকে দেখিবে।

স্বামীকে সে দেখিল। কিন্তু তাহার মুখে যে-দারিদ্র্যের কলঙ্ক দেখিতে পাইয়াছে, সে-কলঙ্কচিহ্ন সে এখন মুছাইয়া দিতে চায়—তাহাকে ঐশ্বর্য্য-শালী করিয়া নিজে পৃথিবীর বুক হইতে সরিয়া পড়িতে চায়।

পথের ধারে ব্রজেশ্বরকে অমন বেশে দেখিয়া তাহার বুকখানা যেন শতধা হইয়া গিয়াছিল, তাহার গায়ের বহুমূল্য অলঙ্কার ছুঁচের মতই গায়ে বিঁধিতেছিল।

একশ'টা টাকা সেদিন ব্রজেশ্বরকে দিয়া আসিয়া সত্যই সে নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইল, ছ'দিন এমন পরিতৃপ্তি সে পায় নাই।

ইহারই দিন চার পাঁচ পরে রঘুনাথ যেদিন সেই নোটখানি তাহার দারোয়ানের হাতে দিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া জানাইল, ব্রজেশ্বর পাঠাইয়া দিয়াছে, সেদিন সে সত্যই আড়ষ্ট হইয়া গেল।

মুক্তি-স্নান

রঘুনাথকে ডাকাইয়া সে ভিতরে আনিল।

কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এ-টাকা তিনি ফেরৎ দিলেন কেন?"

রঘুনাথ বলিল, "তা তো বলতে পারি নে। কাল সে আমার কাছে এসে এখানা দিয়ে জানিয়ে গেছে—আর যেন তুমি এ-রকম করে তাকে কিছু দিয়ো না, সে তোমার দান ছুঁতে ঘৃণা বোধ করে।"

গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নোটখানা আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে সৈকত বলিল, "বেশ তাই হবে। তিনি কি এখন ওখানেই কাজ করবেন, না আর-কোথাও যাবেন—জানতে পেরেছ কি?"

রঘুনাথ বলিল, "সে দুই-একদিনের মধ্যে বরানগরের বাগান-বাড়ীতে যাবে, ওখানকার কাজ দেখা-শুনার ভার তাকে দিচ্ছি।"

সৈকত জিজ্ঞাসা করিল, "মাইনের বন্দোবস্ত হয়েছে?"

রঘুনাথ বলিল, "চল্লিশটাকা করে পাবে।"

সৈকতের বিষণ্ণ মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "তিনি যে ভদ্রভাবে থেকে জীবন কাটাতে পারবেন, এ-ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে আমি তোমায় যথেষ্ট পুরস্কৃত করব রঘু দা,—তিনদিন পরে তুমি আর-একবার এসো।"

রঘুনাথ বাহির হইয়া গেল।

১৫

কলিকাতা ছাড়িয়া বরানগরে আসিয়া ব্রজেশ্বর যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সে এখন সৈকতকে এড়াইয়া চলিতে চায়, তাহার নামটাও যেন ব্রজেশ্বরের পক্ষে অসহ্য। একদিন সেখানে দেখা হইয়াছিল এবং তাহার দারিদ্র্যকে উপহাস করিবার জন্যই সে টাকা দিয়া গিয়াছিল। সে তো আবার আসিতে পারে।

এ-তো তাহার কলঙ্ক নয়, এ-যেন তাহার বিজয়-নিশান…সগর্ব্বে সে উড়াইয়া চলিয়াছে। নিজের দেহ বিক্রয়ের অর্থ সে আনিয়া দেয় স্বামীর হাতে, দেখাইতে চায়—সে জয়ী হইয়াছে,—পরাজয় ঘটিয়াছে অভাগা ব্রজেশ্বরের!

কলিকাতায় থাকিলে যে-কোন দিন আবার তাহার সহিত দেখা হইবে, আবার সে ব্রজেশ্বরকে কোন অছিলায় টাকা দিবে। ব্রজেশ্বর সে-অপমান সহ্য করিবে না, করিতে পারিবে না।

বরানগর কলিকাতার খুবই কাছে, তবু কলিকাতার মধ্যে তো নয়। এখানে সৈকত তাহার সাড়া পাইবে না,—জয়ের গর্ব্ব এতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না।

বাগান-বাড়ীটি ঠিক গঙ্গার উপরেই। পাশে একটি সুন্দর ঘাটও আছে।

১৬

মুক্তি-স্নান

এই বাগানবাড়ী পূর্ব্ববঙ্গের একজন জমিদারের। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি মারা গিয়াছেন, তাঁহার পুত্র এখন সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইলেও লোকে পিতার নামোল্লেখই করিয়া থাকে।

নূতন জমিদার কদাচিৎ এখানে আসেন। বৈঠকখানা এবং আরও কয়েকখানি ঘর খারাপ হইয়া যাওয়ায় মিস্ত্রী লাগানো হইয়াছে, এ-কাজ শেষ হইলে তিনি নাকি মাসখানেক এখানে আসিয়া থাকিবেন।

মনিবের সহিত একদিন ব্রজেশ্বরের দেখাও হইয়াছিল, রঘুনাথই তাহাকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়াছিল।

লোকটিকে যেন পরিচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল কিন্তু কোথায় যে দেখিয়াছে, তাহা ব্রজেশ্বর মনে করিতে পারে নাই।

মোটের উপর ভদ্রলোকের বেশ শান্ত স্বভাব, বেশ হাসিভরা মুখ, ধনী বলিয়া যে অহঙ্কার থাকার কথা—তাহা তাঁহার মধ্যে নাই।

খুসি-মনে ব্রজেশ্বর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছে।

কাজ কিছুই নয়, সকাল হইতে মজুর ও মিস্ত্রীদের কাজ দেখা-শোনা—হিসাব লিখিয়া রাখা। আসিবার সময় রঘুনাথ চুপি-চুপি বলিয়া দিয়াছিল —"মন যুগিয়ে চলতে পারলে এ-কাজ গেলেও ওঁরই ওখানে অন্য কাজ পাবে ব্রজেশ্বর। লোকটা ভারি শান্ত, টাকাও আছে বিস্তর। আর-সবই ভালো, একটা দোষ যে ভারি মদ খায়, আর মদ খেলে জ্ঞান থাকে না। তা হোক না, তাতে তোমার ভালো ছাড়া মন্দ হবে না, কেন না সে-সময় ওর দিলখোলা হয়ে থাকে, হয়তো হাজার টাকা বকসিসই দিয়ে ফেলবে।"

লোক যেমনই হোক, তাহাতে ব্রজেশ্বরের কিছু আসে-যায় না। চল্লিশ

মুক্তি-স্নান

টাকা বেতন যদি নাই-ই হইত, যদি সে মাত্র দশটাকাও পাইত, তথাপি সে বরানগরে চলিয়া আসিত। কলিকাতার বাতাস সে যেন সহিতে পারিতেছিল না, তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

মুক্ত বাতাসে আসিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সত্যই মুক্তজীবন, নিজের জন্ম কোনও ভাবনা নাই। বাগান-বাড়ীতে রাঁধুনী-ব্রাহ্মণ আছে, কয়েকজন ভৃত্য আছে। নির্ব্বিবাদে সে দুইবেলা রাজভোগ খায়, দ্বিতলে বিদ্যুতালোকিত উজ্জ্বল ঘরে বৈদ্যুতিক পাখার তলায় পড়িয়া ঘুমায়।

সকাল হইতে মিস্ত্রীদের কাজ দেখে, হিসাব লেখে। সমস্ত বৈকালটা সে বাঁধা-ঘাটে একা বসিয়া সামনের পানে তাকাইয়া থাকে।

নদীর বুকে ছোট বড় ঢেউ ছুটিয়া চলে, তাহারই তালে তালে হেলিয়া দুলিয়া ছোট বড় নৌকা ছুটে, ষ্টীমারগুলি শব্দ করিয়া দুই পাশে প্রতিধ্বনি তুলিয়া ছুটিয়া যায়। গ্রাম্যবধূরা ঘাটে আসে, কলসী নামাইয়া ঘোমটার আড়াল হইতে একবার দেখিয়া লয়।

নৌকায় দাঁড়ি-মাঝিরা সারি গান গাহিয়া যায়। কোন দিন গায়,—

মন-মাঝি তোর বইঠা নেরে—
আমি আর বাইতে পারলাম না…

কোন দিন গায়—

ডিঙ্গা লাগায়ে বঁধু পান খাইয়া যাও…

শুনিতে বেশ লাগে, ব্রজেশ্বর স্তব্ধ হইয়া শুনে।

জীবনের গত-দিনগুলাকে বিস্মৃতির অতল-তলে বিসর্জ্জন দিতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়।

মুক্তি-স্নান

রাঁধুনী-ব্রাহ্মণ চিন্তামণি পাঁচ-সাত বৎসর এই বাগানে আছে।

সে বাবুর সম্বন্ধে অনেক গল্প করে।

এ বাবু ভারি ভালো লোক, কিন্তু একবার যদি কোন রকমে রাগ হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ, রাগের ঝোঁকে তিনি খুন পর্য্যন্ত করিয়া ফেলেন।

ঘাটের পাশে একটী ছোট রঙীন নৌকা বাঁধা থাকে, বাবু এই নৌকায় চাপিয়া গঙ্গায় হাওয়া খাইতে যান, সঙ্গে থাকেন ছোট মা।

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ছোট মা মানে? বাবুর কি দুই পরিবার?"

চিন্তামণি একটু হাসিয়াছিল, যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই বলিয়াছিল, "না বাবু, বাবুর একটী মাত্র বিয়ে, ··এ বিয়ের পরিবার নয়। বড় মা তো বাবুর সঙ্গে কোথাও যান না, আর তিনি যখন আসেন—একাই আসেন, বাবু তখন আসেন না। বাবু যখন আসেন তখন সঙ্গে থাকেন ছোট মা। তা তিনি যাই হোন, ভা-রি চমৎকার লোক,—সকলকে এত ভালোবাসেন যে বলা যায় না। চাকর-বাকর কারও অসুখ হলে ছোট মা নিজে তাদের দেখা শুনা করেন, সেবা-শুশ্রূষা করেন। অমন মানুষ কিন্তু আর একটী দেখি নি বাবু,—হলই বা বেবুশ্যে, মনটা দেবীর মত!

ব্রজেশ্বর চুপ করিয়া শুনিয়া যায়।

মনে হয়, কোনদিন হয় তো সে এই ছোটমাকে দেখিতেও পাইবে।

ছোটমার প্রশংসা শুনিয়া মনে মনে তাহাকে দেখার বাসনাও জাগে।

১৬

বাবুর আদেশে ব্রজেশ্বরকে দিন-কয়েকের জন্য জয়পুরে যাইতে হইয়াছিল পাথরের চেষ্টায়। জয়পুরের পাথর নাকি বিখ্যাত, বাবু সেখান হইতে পাথরের কিছু জিনিস-পত্র আনাইতে চান।

কয়েকটা দিন পরে সে পরিশ্রান্ত ভাবে কলিকাতায় ফিরিল, সঙ্গে বাবুর আদেশানুযায়ী পাথরের জিনিস।

বাবুর বাড়ীতে গিয়া শুনিতে পাইল, তিনি আজ কয়েকদিন হইল বরানগরে গিয়াছেন, আজ-কালেই তাঁহার ফিরিবার কথা আছে।

জিনিস-পত্রগুলা বাবুর বাড়ীতে রাখিয়া, স্নানাহার সমাপনান্তে সে বরানগরে রওনা হইল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদখানা উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছে, তাহার শুভ্র আলোক পথের উপর, দু-পাশের গাছ-লতা-পাতা ছোট ছোট কুটীরগুলির উপর ছড়াইয়া পড়িয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে।

শীত কাটিয়া গিয়াছে, ফাল্গুনের শেষ। দক্ষিণা-বাতাস গাছের পাতা কাঁপাইয়া যাইতেছে, পথের পাশে একটা গাছে একটা নাম-না-জানা পাখী কি গান গাহিতেছে।

ব্রজেশ্বর দ্রুত চলিতেছিল।

মুক্তি-স্নান

বাগানবাড়ীর গেটের কাছে গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে কে গান গাহিতেছিল। অর্গানের মিষ্ট সুরের চেয়েও তাহার কণ্ঠস্বর মধুর!

ব্রজেশ্বর উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

গায়িকা গাহিতেছিল—

> কত রাতি পোহায় বিফলে হায় জাগি জাগি ··
> সে কোথায় দূর-বিদেশে হেসে কাটায় মধুরাতি—
> হেথা যে বুকে আমার জ্বলে মরে আশা-বাতি,
> ভুলেছে সে—তবু কেন তারে সাধি—

অন্যমনস্কভাবে ব্রজেশ্বর দুই-এক পা অগ্রসর হইল।

সুন্দর শুভ্র জ্যোৎস্না সমস্ত বাগানখানির উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পথের দুই পাশে গোলাপ গাছে থোকা-থোকা ফুল ফুটিয়া দক্ষিণা-বাতাসে দোল খাইতেছে।

এই জ্যোৎস্না-রাত্রিতে কোথায় কোন্ বিরহিণী হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে—তাহার প্রিয়কে ডাকিতেছে—কিন্তু কোথায় তাহার সে প্রিয়, —সে কোথায় কোন্ দূর-বিদেশে কোনো প্রণয়িনীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া হাসিয়া রাত্রি কাটায়,—তাহার পূর্ব্বপ্রিয়ার কথা মনেও নাই।

যে ভুলিয়া যায় তাহার কথাই বা মনে পড়ে কেন, মানুষের একি মনের দুর্ব্বলতা? যে চলিয়া গেছে তাহারই খোঁজ লইবার জন্য মন কেন ব্যাকুল হইয়া উঠে? হয়তো সে পুরাতন কথা ভুলিয়া গেছে, সে পিছনের পানে ফিরিয়াও চায় না, তাহার অতীত নাই—আছে শুধু

বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ,—এবং দুইই তাহার আনন্দে পূর্ণ—আলোয় আলোয় উজ্জ্বল। হায় রে, সব জানিয়াও মন তবু তাহাকেই চাহিয়া ফিরে!

কত রাত্রি বিনিদ্র কাটিয়া যায়,—অতীতের কত কথাই না মনে পড়ে। অতি ক্ষুদ্র কথা, অতি ক্ষুদ্র ঘটনাগুলা—যাহা যখন আসিয়াছিল তখন দৃষ্টিতেই পড়ে নাই, অথচ মনের অতল-তলে চাপা পড়িয়াছিল, তাহাই সেই নিস্তব্ধ রাত্রে মনে পড়ে, সেই ক্ষুদ্রই তখন অতি-বৃহৎ বলিয়া মনে হয়।

ব্রজেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

মানুষ যখন যাহা পায় তখন তাহার মূল্য বোঝে না, তাই অনাদরে হারাইয়া ফেলে। যখন মূল্য বোঝে, তখন আর তাহা পাওয়া যায় না, তৃষ্ণাও হইয়া উঠে তখন অফুরন্ত।

"কে, কে ওখানে—?"

"আমি···ব্রজেশ্বর—"

ব্রজেশ্বর অগ্রসর হইল।

বাবু বারাণ্ডায় একখানা ইজিচেয়ারে কয়েকজন বন্ধু সহ বসিয়া ছিলেন, ব্রজেশ্বর অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

বাবু বলিলেন, "কবে ফিরলে জয়পুর হতে, জিনিসপত্র এনেছ?"

বিনীত ভাবে ব্রজেশ্বর বলিল, "আজ্ঞে আজই এসেছি, জিনিস-পত্রও সব আনা হ'য়েছে। সে-সব আপনার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে শুনলুম আপনি এখানে এসেছেন, আমি আপনার বাড়ীতেই সব দিয়ে চলে এসেছি।"

বাবু ভারি খুসি হইয়া বলিলেন, "বেশ করেছ। গিন্নির আবার ভারি ঝোঁক হল ওই সব জিনিসের ওপর। ধরলেন যখন—না বলতে পারলুম না।

বেচারা···সত্যি ওঁর জন্যে দুঃখও হয়—বুঝলে হে? এক-একবার ভাবি,—যাক গে, সব ছেড়ে দিয়ে ভালো মানুষ হয়ে বাড়ীতেই থাকি। ছেলেটা বড় হয়ে উঠলো, ছয় সাত বছর বয়েস হল, এখনই জিজ্ঞাসা করে—'বাবা, তুমি ও-সব ছাই-ভস্ম খাও কেন, মাকে বক কেন?' ভাবি—আর দু' বছর গেলে এর পর এ-সব ব্যাপার আর কি চাপা থাকবে তার কাছে, তখন সে কি আর আমায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারবে?"

ব্রজেশ্বর কোনো কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

হলের মধ্যে তখনও গান হইতেছিল—

মলয়ে দোলে শাখী ভাবি সে বুঝি এলো—
চকিতে নড়লে পাতা চমকে উঠি যে লো, ..

চলিতে চলিতে জানালার ফাঁকে গায়িকার মুখের পানে তাকাইয়াই ব্রজেশ্বর বজ্রাহতের মত থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

একি—বকুল···!

দুই হাতে সে চোখ মুছিল, মনের ভুলও তো হইতে পারে।

কিন্তু না, ভুল নয়, এ-বকুলই—এ-সৈকত।

অন্তরালে দাঁড়াইয়া ব্রজেশ্বর পলকহীন-নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

সেই সৈকত, ছিন্ন মলিন শাড়ী ছাড়া তাহার অঙ্গে ভালো শাড়ী কেউ কোনদিন দেখিতে পায় নাই। হাতে ছিল দুইটী মাত্র শাঁখা, সোনার চিহ্ন মাত্র তাহার অঙ্গে ছিল না, তথাপি তখন তাহাকে দেখিয়া সম্ভ্রমে মাথা নত হইয়া পড়িত।

মুক্তি-স্নান

আর এই সৈকত···

বিলাসের প্রতিমূর্ত্তি, সর্ব্বাঙ্গে হীরামুক্তা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—মূল্যবান্ শাড়ী তাহার পরিধানে, কিন্তু কোথায় তাহার সে পবিত্র ভাব?

এই রাজৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও সৈকত যেন বড রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহার মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া-টিপিয়া ব্রজেশ্বর নিজের ঘরে চলিল।

যাওয়ার সময় চিন্তামণিকে বলিয়া গেল—তাহার শরীর আজ বড় অসুস্থ, সে কিছুই আহার করিবে না। বাবু যদি ডাকেন—তাঁহাকে সে যেন এ-কথা একটু জানাইয়া দেয়।

নম্র স্বভাবের জন্য চিন্তামণি তাহাকে সত্যই একটু ভালো বাসিয়াছিল। সে জানাইল যে, বাবু ডাকিবার আগেই জানাইয়া দিবে, সেজন্য কোনও চিন্তা নাই।

১৭

সে-রাত্রে ব্রজেশ্বর মোটেই ঘুমাইতে পারিল না। বিছানায় পড়িয়া খানিক রাত ছটফট করিয়াছিল, তাহার পর সকলে শুইয়া পড়িলে, সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

চাঁদ তখনও হাসিতেছে। মাধবী-কুঞ্জের আড়ালে থাকিয়া একটা পাপিয়া চীৎকার করিতেছে—'চোখ গেল—চোখ গেল—'

অস্থির ভাবে ব্রজেশ্বর পাদচারণা করিতে লাগিল।

বিশ্বাসহন্তা রঘুনাথ···

বিক্ষুব্ধ চিত্ত গর্জিয়া উঠিতেছিল।

হাঁ, সে জানিয়া শুনিয়াই ব্রজেশ্বরকে এখানে কাজে লাগাইয়াছে, এই নিকৃষ্টা গণিকার অর্থ লইতে তাহাকে বাধ্য করিয়াছে।

নিশ্চয়ই পূর্ব্ব হইতে ষড়যন্ত্র ছিল।

আহত সর্পের মত ব্রজেশ্বর গর্জিতে লাগিল।

এই শয়তানীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সে তো জানে নাই—শয়তানীই সর্ব্বপ্রকারে জয়লাভ করিবার জন্য এই এক অভিনব উপায় সৃষ্টি করিয়াছে।

সে দরিদ্র, তাই না তাহাকে এত সহজে সে আয়ত্তে আনিতে পারিয়াছে। যদি তাহার দিন চলিবার উপযুক্ত সম্পত্তি থাকিত, যদি সে ভালো লেখা-পড়া জানিয়া কোনও একটা চাকরী করিত—

মুক্তি-স্নান

ব্রজেশ্বরের দুইটী চোখে আগুন জলিয়া উঠিল, দাঁতের উপর দাঁত র‍া য়া আপনা আপনিই সে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু আমিও পারি—আমিও প্রতিশোধ নিতে জানি।"

দুই হাত বুকের উপর পাশাপাশি ভাবে রাখিয়া সে উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল।

সামনের ঘরের দরজা খোলা···

একটা মোমবাতি একপাশে টিপ্‌টিপ্ করিয়া জলিতেছে, বৈদ্যুতিক বা‍তি নিভানো ··

ব্রজেশ্বর আস্তে আস্তে দরজার উপর দাঁড়াইল।

জানালা দিয়া এক ঝলক চাঁদের আলো নীচে বিছানাটার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই বিছানার উপর ঘুমাইয়া আছে সৈকত, যেন শুভ্র একটা গোলাপের তোড়া! পাশের ঘরে অপর-একটা বিছানায় নিদ্রামগ্ন হরিপ্রসন্নবাবু।

ব্রজেশ্বরের মনের পৈশাচিক ভাব তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল।

পা টিপিয়া টিপিয়া সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সৈকতের বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল—ঠিক যেমন শিকার সামনে রাখিয়া ব্যাঘ্র থাবা পাতিয়া তাহার পানে চাহিয়া থাকে।

সৈকত একটু নড়িল—পাশ ফিরিয়া শুইতে গিয়া হঠাৎ চাহিল। তারপর অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল, "কে—কে তুমি—"

মুক্তি-স্নান

দৃপ্তকণ্ঠে ব্রজেশ্বর বলিল, "চিনতে পারছ না? ভালো করে চেয়ে দেখ দেখি—চিনতে পারো কি-না?"

সৈকত তাহার পানে তাকাইল, পর মুহূর্ত্তে দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া সে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল—"এসেছ···তুমি এসেছ···"

হরিপ্রসন্ন বাবুর নাসিকা-ধ্বনি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল।

ব্রজেশ্বর গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "হাঁ্যা এসেছি। কিন্তু কেন এসেছি জানো? তোমায় শাস্তি দেওয়ার জন্যে। তুমি আমায় পরাজিত করেছ, পদে-পদে আমার অনুসরণ করছ—তোমারই ষড়যন্ত্রে আজ আমায় হীন গণিকার অর্থ নিয়ে ক্ষুধা তৃপ্তি করতে হ'য়েছে। তুমি জয়ীর গর্ব্ব করছ—আমি এই দর্প, এই গর্ব্ব তোমার দূর করতে এসেছি। আমি তোমায় খুন করব সৈকত—তুমি প্রস্তুত হও, ঈশ্বরের নাম কর।"

সৈকত উঠিয়া বসিল, তাহার দুই চোখ দিয়া তখন অশ্রুধারা ঝরিতেছে!

হাত দু'খানা বুকের উপর রাখিয়া আর্দ্রকণ্ঠে সে বলিল, "তাই কর গো তাই কর। আমায় খুনই তুমি কর—আমি মুক্তি পাই। কতবার মরতে গিয়ে মরতে পারি নি, তোমায় না দেখে—তোমার কাছে ক্ষমা না চেয়ে মরতে আমার সাহস আসে নি। এইবার তুমি আমায় খুন কর—আমি বাঁচি···বাঁচি আমি— !"

"ব্রজেশ্বর—"

পিছনে একি বজ্র-হুঙ্কার!

ব্রজেশ্বর পিছনে ফিরিল—হরিপ্রসন্ন বাবু দণ্ডায়মান—তাঁহার হাতে উদ্যত রিভলভার!

গর্জিয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, "এ কি ব্যাপার? এই গভীর রাত্রে এ-ঘরে তুমি কেন?"

ব্রজেশ্বর নীরব, ওষ্ঠ মাত্র কাঁপিল।

রিভলভার উঁচু করিয়া হরিপ্রসন্ন বাবু বলিলেন, "বল—উত্তর দাও, নচেৎ এখনি তোমায় গুলি করব।"

ব্রজেশ্বর তখনও নীরব, জীবনের ভয় সে করে না।

সৈকত ধড় মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—হরিপ্রসন্ন রায়ের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া কান্নাভরা স্বরে বলিল, "দোষ ওঁর নয়, দোষ আমার—আমিই ওঁকে এ-ঘরে এনেছি।"

"তুমি···তুমি ডেকে এনেছ বকুল?—"

হরিপ্রসন্ন রায়ের উদ্যত হস্ত নামিয়া পড়িল। একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি আজ পাঁচ বছর আমার কাছে রয়েছ, না বকুল? তোমার জন্যে আমি আমার সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীর পানে ফিরে চাই নি, একমাত্র সন্তানের মুখের দিকে চাই নি, সেই তুমি—সেই তুমি বকুল—তুমি এই? রাক্ষসী কোথাকার—"

বলিতে বলিতে তিনি পদাঘাতে সৈকতকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন।

ব্রজেশ্বর অগ্রসর হইয়া বলিল—"মেয়েদের গায় হাত তুলবেন না বাবু—"

আরক্তিম মুখে হরিপ্রসন্ন রায় বলিলেন, "চুপ, তোকে আমি গুলি করব, সঙ্গে সঙ্গে ওকেও গুলি করে মারব—"

তিনি আবার রিভলভার তুলিলেন।

কাঁপিতে কাঁপিতে সৈকত বলিল, "আগে আমার একটা কথা শোন, তারপর তুমি যা খুসি করো।"

মুক্তি-স্নান

হরিপ্রসন্ন রায় মাথা নাড়িলেন,—"না, একটা কথাও শুনতে চাই নে।"

সৈকত দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "তোমার শুনতে হবেই; যাঁকে তুমি গুলি করে মারতে যাচ্ছো, তিনি আমার স্বামী·· আমি একদিন ওঁর বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী ছিলুম—"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে উপুড় হইয়া পড়িল।

আর্ত্তকণ্ঠে ব্রজেশ্বর চীৎকার করিয়া উঠিল, "সৈকত—"

হরিপ্রসন্ন রায়ের হাত হইতে রিভলভারটা খসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল—ধড়াম করিয়া গুলি ছুটিয়া গিয়া দেয়ালে বিঁধিল।

ধীরপদে ব্রজেশ্বর বাহির হইয়া যাইতেছিল—হরিপ্রসন্ন রায় তাহার হাতখানা দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিলেন, "দাঁড়াও! তোমায় আমি সহজে ছাড়ব না।"

রিভলভারের শব্দে সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সকলেই ছুটিয়া আসিল। দুই-একজন পুলিশও গেটে আসিয়া দাঁড়াইল।

চিন্তামণির পানে তাকাইয়া হরিপ্রসন্ন রায় বলিলেন, "ছুটে যাও চিন্তামণি, পুলিশ ডাক, এই খুনে' লোকটাকে আমি পুলিশের হাতে দেব।"

বিস্মিত ভাবে একবার ব্রজেশ্বরের পানে তাকাইয়া চিন্তামণি বাহিরে

মিনিট দশেকের মধ্যে বাগান-বাড়ী পুলিশে ভরিয়া উঠিল।

তখনও ব্রজেশ্বর সেই ভাবে দাঁড়াইয়া।

সৈকত এক কোণে দাঁড়াইয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

তাহারই চোখের সামনে পুলিশ ব্রজেশ্বরের হাতে হাতকড়া পরাইল, তাহাকে টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। ব্রজেশ্বর তখনও নীরব, একটি-বার মুখ ফুটিয়া বলিল না—সত্যসত্যই সে সৈকতের স্বামী।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাগান-বাড়ী আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

১৮

দিনের সমাধি অনন্ত অন্ধকারের গর্ত্তে। দিনের সাথী চলিয়া গিয়াছে,—ফুল, পাখী, হাসি-গান ও আনন্দ বিদায় লইয়াছে, অন্ধকারের বুক চিরিয়া উঠিতেছে কেবল আর্ত্ত একটা কান্নার সুর, সর্ব্বহারার বুকের দীর্ঘশ্বাস!

সৈকত ভাবে—কেন এমন হইল, কেমন করিয়া এ-সব ঘটিল।

জীর্ণ জীবন-ইতিহাসের পাতাগুলা উল্টাইতে বসে। তাহাতে শুধু লেখাই নাই,—সমসাময়িক চিত্রও অনেক আছে। একটা কথা পড়িতে গেলেই হাজার চিত্র জাগিয়া উঠে—যেন বায়স্কোপের ছবি!

মানুষের জীবনে এমন পরিবর্ত্তনও কি আসে?

সে কোথায় ছিল—আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কোথায়? একদিন যে কল্পনা সে করে নাই, করিতে পারে নাই, আজ সে সেইখানে আসিয়াছে, একদিন যে-শ্রেণীর মেয়েদের পানে তাকাইয়া সে ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া উঠিত, আজ সে সেই শ্রেণীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

দুইহাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া সে লুটাইয়া পড়ে—"আমায় সেই ভিটেতেই রাখলে না কেন ভগবান,—আমায় কেন এ-ভাবে এ-পথে নিয়ে এলে?"

মনে পড়ে—ধূ-ধূ করিয়া ঘর দু'খানা কি-রকম করিয়া জ্বলিয়া গেল,—তাহার স্বামীর ভিটার চিহ্নমাত্রও রহিল না।

বাড়ীর সামনে ও পাশে ভদ্রলোকদের বাড়ী। সৈকত সেই বাড়ীগুলার পানে তাকাইয়া থাকে। জানালায় দরজায় মেয়েদের দেখা যায়। সৈকত তাহাদের পানে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

একদিন সে-ও তো উহাদেরই সমপদস্থ ছিল, একদিন সে-ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে সতী-সাবিত্রীর সমান হইবার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছে। আজ সেদিনের কথা সে ভাবে, মনে হয় আশীর্ব্বাদের মূল্য এতটুকুও নাই, সবই ভুয়া।

দেহ তাহার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্তর? আজও সে সেই স্বামীকেই প্রণাম করে, তাহারই মঙ্গল কামনা করে, কিন্তু সে-কথা জানে কে—বুঝিবে কে?

মানুষ বিচার করে বাহিরের দিক, ভিতরের পানে তো চায় না, অন্তরের দুঃখ-বেদনা চাপা থাকিয়া যায়, বাহিরের হাসিটাই মানুষের চোখে পড়ে।

কী মর্ম্মন্তুদ্ যন্ত্রণা! বুকটা যদি লোহার হইত—এ-আগুনে হয়তো এতদিন কবে দ্রব হইয়া যাইত। কিন্তু এ-যে লোহার চেয়েও শক্ত উপাদানে তৈরী, তাই এ-বুক দ্রব হয় নাই, এখনো ফাটে নাই।

সৈকত ভাবে—জেলের মধ্যে ব্রজেশ্বর কি করিতেছে।

দীর্ঘ তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড,—মিথ্যা সে এ-দণ্ড মাথা পাতিয়া লইল। সে যদি একবার বলিত—সৈকত তাহার স্ত্রী, সৈকত তাহাকে ডাকিয়াছিল বলিয়া সেই গভীর রাত্রে সে-ঘরে সে গিয়াছিল, হত্যার উদ্দেশ্য তাহার ছিল না, তাহা হইলে তো সব ব্যাপার মিটিয়া যাইত, সে মুক্তিলাভ করিত।

কিন্তু সে একটী কথাও বলে নাই, বরং স্পষ্টই বলিয়াছিল—সে খুন হয়-তো করিত, যদি না বাধা পাইত।

সশ্রম কারাদণ্ড···দীর্ঘ তিন বৎসরের···

সৈকতের চোখে জল আসে। জেলের মধ্যে কয়েদীরা যে কি ভাবে দিন কাটায়, সে-সম্বন্ধে অনেক কথা সে লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছে।

শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে হয়তো কাজ করিতে পারে না, তখন তাহাকে প্রহারও সহ্য করিতে হয়,—সে তো বড় কম নির্য্যাতন নয়।

হরিপ্রসন্ন বাবু আর আসেন নাই, সৈকত বাঁচিয়া গিয়াছে।

মানুষ—মানুষ হোক, আজ সে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করে। মানুষের মধ্যেকার পশুবৃত্তি চাপা পড়িয়া যাক, তাহার দেব-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠুক, সকলের সংসার সুখময় শান্তিময় হোক, সকলের সংসার স্বর্গ হোক্‌—পতিতা সৈকত নরকে নামিয়া এই প্রার্থনা করে। সেই স্বর্গে প্রবেশের অধিকার সে চায় না, দূরে থাকিয়া দেখিতে চায়···সেই তাহার পরম সান্ত্বনা।

অতুল ঐশ্বর্য্য তাহার, কিন্তু এ-ঐশ্বর্য্য যে সূঁচের মতই বুকে বিঁধিতেছে!

সৈকত সমস্ত গহনা খুলিয়া রাখিয়াছে, তাহার হাতে কেবল মাত্র দুইটি শাঁখা আছে, মূল্যবান শাড়ী ছাড়িয়াছে, পরিধানে মোটা লালপাড় শাড়ী।

পাশের বাড়ীর দরিদ্র কেরাণীর স্ত্রীটি আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া থাকে। সে একদিন সৈকতকে বিলাসে ডুবিয়া থাকিতে দেখিয়াছে, আজ আবার তাহার ত্যাগও দেখিল।

মুক্তি-স্নান

মেয়েটি সেদিন মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি-বেশ ধরলে দিদি, তোমাকে বাপু মোটেই মানাচ্ছে না।"

সৈকত হাসিয়া উত্তর দিল, "এই আমার সত্যিকার বেশ বোন্, চিরকাল এই বেশেই কাটিয়েছি, তারপর মাঝে এমন জায়গায় এসে পড়েছিলুম—"

বলিতে বলিতে তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটা অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

বউটি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আগে তুমি তা হলে গেরস্ত-ঘরের বউ ছিলে দিদি?—ঠিক আমাদেরই মত?"

চোখ মুছিয়া আর্দ্রকণ্ঠে সৈকত উত্তর দিল, "ঠিক তোমাদেরই মত ভাই, ঠিক তোমাদেরই মত হাতের রুলি বিক্রি করে ঘরের ভাত যোগাড়ও হয়েছে, নতুন কাপড় বিক্রি করে খরচ চালাতে হয়েছে। একদিন তোমাদেরই মত বাসন মেজেছি, রেঁধেছি,—আর আজ—কিন্তু না, সে-সব কথা থাক ভাই,—তবে এইটুকু জেনে রেখো, আমায় যেমনটি দেখছ আমি তেমন ছিলুম না।"

কণ্ঠ তাহার একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়।

মনে হয়, বউটি তাহার কথা বিশ্বাস করে না, তাহার এই ত্যাগটাকেও একটা-কিছুর জন্য কৌশল বিস্তার বলিয়া ধরে, তাহার মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠে মাত্র!

সত্যই তো—বিশ্বাস করিবে কে? কেহই তো জানিবে না সে কি,—সকলে তাহার ত্যাগকেও ছলনা বলিয়াই জানিবে।

এক-একবার মনে হয় সমস্ত সম্পত্তি বিলাইয়া দিয়া সত্যই সে সন্ন্যাসিনী হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। জীবনে তাহার সম্মুখে এই একটি মাত্র পথ খোলা আছে, আর কোনও পথ নাই, সবই বন্ধ।

মরিতে তাহার সাহস নাই, মনে হয় মরণের পরে তাহার জন্য অনন্ত দণ্ড তোলা আছে। সে এখনও প্রায়শ্চিত্ত করে নাই, প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সে মরিতে পারিবে না।

কিন্তু সম্পত্তি বিলাইয়া দিবে কাহাকে?

কাহাকেও সে দিতে পারিবে না, তাহাতে তো সে তৃপ্তি পাইবে না—শান্তি পাইবে না! সে দিবে তাহাকে—যাহার সমস্ত সুখ-শান্তি সে হরণ করিয়াছে।

কিন্তু সে যদি গ্রহণ না করে...

চোখের সামনে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, দুইহাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া নৈকত ভাবে—সে তবে কি করিবে? কাহার জন্য এ-যক্ষের ধন আগ্‌লাইয়া রাখিবে?

১৯

জেলের মধ্যে রোগশয্যায় পড়িয়া আছে ব্রজেশ্বর। আজ কয়দিন হইতে তাহার জ্বর।

প্রথম দিনটাও সে কাজ করিয়াছিল, তাহার পর আর উঠিতে পারে নাই।

সকালে জ্বর খুবই কম ছিল, বিছানার উপর চোখ মুদিয়া সে পড়িয়া ছিল।

হিসাব করিয়া দেখিতেছিল—বাহির হইবার আর কত দিন বাকি। কিন্তু মাত্র ছয় মাস কাটিয়াছে, আরও দীর্ঘ কাল বাকি।

এক-একবার মনে হয়—এই ভালো,—কাজ করিতে সে ভয় পায় না, নিশ্চিন্ত ভাবে দুই বেলা দুইটা ভাত তো সে খাইতে পায়।

জেলের দরজাটা ঝন্ ঝন্ করিয়া খুলিয়া গেল, ব্রজেশ্বর সেই শব্দে চমকাইয়া চাহিল।

দরজার উপর দাঁড়াইয়া ও কে! এ-কি স্বপ্ন না সত্য? জেলখানার অন্ধকারে বাস করিয়া তাহার মস্তিষ্ক কি সত্যই বিকৃত হইয়া গিয়াছে?

বিহ্বল ভাবে তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া সৈকত অগ্রসর হইয়া আসিল, ধীরে ধীরে তাহার বিছানার পার্শ্বে মাটিতে বসিয়া পড়িল।

মুক্তি-স্নান

"আমায় চিনতে পারছো না, আমি ···আমি সৈকত।"

"সৈকত ?"

ব্রজেশ্বর অকস্মাৎ বালিশের মধ্যে মুখখানা লুকাইল, ঘৃণাভরে হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "ফের এখানেও এসেছ শয়তানী। যাও—দূর হয়ে যাও আমার সুমুখ থেকে। আমি তোমায় দেখতে চাই নে।"

সৈকত একেবারে তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, চোখের জলে তাহার পা দু'খানা ভিজাইয়া দিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "চলেই যাব গো, এখানে থাকব বলে আসি নি। এতদিন চলে যেতুম—কেবল তোমার সব কথা বলে যাব বলেই যাই নি।...আমার 'পরে অত নিঠুর হয়ো না গো, দয়া করে আমার দুটো কথা শোন, তারপর আমি একেবারেই চলে যাব, আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসব না।"

ব্রজেশ্বর নড়িল না—নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া সৈকত বলিল, "নিঠুর, কেবল নিজের দিক-টাই দেখে আসছ, আর কারও পানে চাইতে পারলে না, আর কারও অন্তর দেখতে পারলে না ? ওগো নির্দ্দয়, একটীবার চাও, আমার একটী-কথা শোন, তারপর আমায় বিদায় দিয়ো।"

ব্রজেশ্বর উঠিয়া বসিল।

রুক্ষ তাহার মুখ, দুই চক্ষে হিংস্র দৃষ্টি। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার কাছে কি চাও, কেন এমন করে আমার অনুসরণ করছ ?"

অঞ্চলে চোখ মুছিয়া সৈকত বলিল, "তোমার কাছে কিছুই চাই নে, চাওয়ার দাবি আমার ফুরিয়ে গেছে, সেই জন্যেই চাইতে পারব না।

তোমায় আমি অনুসরণ করেছি এ-কথা ঠিক, কিন্তু কেন যে করেছি তা তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারবো না।"

সে মুখ নত করিল।

ব্রজেশ্বর বলিল, "কেবল এই কতকগুলো বাজে কথা বলবে বলেই কি তুমি এখানে এসেছ? আমি তোমায় দেখতে চাইনে বলেই কলকাতা থেকে সরে গিয়েছিলুম, জানতুম না যে, তুমিই আমায় বরানগরে নিজের ঐশ্বর্য্য দেখানোর জন্যে—"

হাত দু'খানা জোড় করিয়া কাতরকণ্ঠে সৈকত বলিল, "না, না, ঐশ্বর্য্য দেখানোর জন্যে নয়, তোমার দিব্যি,—আমার এটুকু বিশ্বাস কর—তোমায় আমি অপমান করতে চাই নি, তোমার দুঃস্থ অবস্থা নিজের চোখে দেখে আমি সহ্য করতে পারি নি·· তাই!"

ব্রজেশ্বর বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলিল, "তাই মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনের বন্দোবস্ত করে আমায় তোমার বাগান-বাড়ীতে চাকর রেখেছিলে? তোমার এ-দয়ার জন্যে তোমায় সহস্র ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু আমাকে সেই জন্যে, —গণিকার অর্থে দেহ রক্ষা করবার পাপের যথেষ্ট শাস্তি বইতে হল— এখনও হবে।"

"গণিকা—" সৈকতের অজ্ঞাতসারেই তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—কেবল এই একটামাত্র শব্দ।

কঠিন একটু হাসির রেখা ব্রজেশ্বরের মুখে ভাসিয়া উঠিল। বলিল, "না, তুমি সাবিত্রী।"

তারপর এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিল, "কিন্তু চমৎকার অভিনয় করেছিলে সৈকত, কেউ দেখে বলতে পারে নি সত্যিই তুমি

সাবিত্রী নও। আমি পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম! আমি তখন ভাবছিলুম কি জানো? ভাবছিলুম, যে এত সুন্দর অভিনয় করতে পারে, সে এতটা খারাপ হল কি করে?"

আর্দ্রকণ্ঠে সৈকত বলিল, "কেবল বাইরেটা দেখেই বিচার করলে, অন্তরটা একবার দেখলে না? একবার জানতেও তো চাইলে না—আমি কেন এ-পথে এসে দাঁড়ালুম।"

ব্রজেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে-কথা জানবারও আমার দরকার নেই।"

সৈকত শক্ত হইয়া বলিল, "দরকার নেই বললে চলবে না, তোমার শুনতেই হবে, আমি তোমায় আজ সব শুনিয়ে যাব।"

ব্রজেশ্বর কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু—সৈকত তাহাকে কথা বলিতে দিল না।

ব্রজেশ্বরের গৃহত্যাগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নিজের সমস্ত কথা সে অকপটে বলিল। ব্রজেশ্বর পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল, তাহার মুখের ভাবটুকু পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইল না।

সমস্ত কথা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া, সৈকত তাহার মুখের পানে নিষ্পলকে তাকাইয়া রহিল।

ব্রজেশ্বর অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলিল। বলিল, "চমৎকার গল্প, কিন্তু এ-গল্প আমার কাছে না বললেই ভালো হতো। জানোই তো, আমি তোমায় কোনোদিন আর ক্ষমা করতে পারব না, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহুদিন উঠে গেছে। আমার করুণা-প্রার্থিনী হয়ে তুমি দাঁড়াবে—এ-আশাও আমি কোনোদিন করি নি, কেন না আমি দীন-দরিদ্র, আমি—

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সৈকত বলিল, "আমি সেজন্য তোমার কাছে আসি নি, এসেছি অন্য কারণে। আমি জানি আমি করুণার পাত্রী নই,—আমি আমার ধর্ম্মই শুধু হারাই নি, নিজের দেহ পর্য্যন্ত ধ্বংস করেছি। দেবতাকে পূজো করবার প্রত্যক্ষ অধিকার আমি হারিয়েছি; দেবমন্দিরে উঠবার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু বল দেখি—পরোক্ষভাবেও দেবপূজার অধিকার আমার নেই কি? দেখেছি অনেক অন্ত্যজও পূজো দিতে যায়, তারা মন্দিরের বাইরে দাঁড়ায়, পয়সায় কেনা জিনিষ তাদের নামের অর্ঘ্য পুরোহিতই তো দেবের পায়ে দিয়ে থাকে, তাতে তো তাদের পূজো অসার্থক হয় না।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "তোমার হেঁয়ালি-ভরা কথা বুঝবার ক্ষমতা আমার মত মূর্খের নেই—তা বোধ হয় জানো?"

সৈকত বলিল, "অর্থাৎ—সহজ কথায় বলতে চাই—আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমায় দিয়ে চলে যেতে চাই।"

ব্রজেশ্বর স্তম্ভিত হইয়া গেল, কয়েক মুহূর্ত্ত সে কথা কহিতে পারিল না।

হঠাৎ তাহার লুপ্তশক্তি ফিরিয়া আসিল, সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কখনও না, তোমার দেহ-বিক্রির অর্থ,—ও আমি কখনও স্পর্শ করতে পারব না।"

সৈকত তাহার পায়ের উপর মাথাটা রাখিল, রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু গণিকার অর্থেও তো দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, দেবতার অর্চ্চনা চলে। আমার অর্থে আমি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করব, দেবতা স্থাপনা করব, এতে বাধা দেওয়ার অধিকার তো কারও নেই।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "সে তুমি করতে পার। কিন্তু আমাকে এর মধ্যে

জড়াবে না বলেই জানি। পুরোহিত তুমি ঢের পাবে—আমায় ছেড়ে দিয়ো, আমি তোমার অর্থ স্পর্শ করব না—এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

সৈকত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "নেবে না?"

ব্রজেশ্বর দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "না, আমার প্রতিজ্ঞা অটল, আমি গণিকা বকুলের সংস্পর্শে যেতে চাই নে, তার অর্থে ধনী হতে চাই নে। আমি দীন-দরিদ্র হয়েই থাকব, আমি কুলীর কাজ করব—সেই আমার ভালো।"

সৈকত নতমুখে অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, ব্রজেশ্বর তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়া রহিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সৈকত ডাকিল, "একবার মাথাটা তোল, প্রণাম করে যাই।"

ব্রজেশ্বর মাথা তুলিল, "এটুকু প্রহসনের তো দরকার ছিল না সৈকত।"

সৈকত প্রণাম করিয়া, দুই পায়ের ধুলা মাথায় দিয়া বলিল, "যদি সত্যিকার প্রাণ থাকত, হয় তো অনুভব করিতে পারতে।·· আমি চললুম, আর জীবনে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি না, ভগবান জানেন। যদি কোনদিন্ দেখা হয়—সৈকতকে অন্তরূপেই দেখতে যেন পাও—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।···আত্মহত্যা আমি করব না, কেবল সেই দিনটী পাওয়ার প্রত্যাশায় থাকব,—যেদিন তোমাকে আমার সত্যিকার পরিচয় দিতে পারব।"

আবার প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে সে বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইতে ঝন্ ঝন্ করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

২০

সৈকত আড়ষ্টের ন্যায় গাড়ীর ভিতর বসিয়া ছিল। জেলখানা হইতে তাহার নিজের বাড়ী পর্য্যন্ত কম পক্ষে এই তিন চার মাইল পথ যেন সে নিতান্ত অজ্ঞান অবস্থাতেই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে।

আজ ব্রজেশ্বর তাহাকে যে রূঢ় অপমান করিয়াছে, সৈকত জেলখানায় যাইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রত্যাশা করে নাই যে, ব্রজেশ্বর এ-ভাবে তাহাকে অবজ্ঞার সহিত বিতাড়িত করিয়া দিতে পারিবে। দীর্ঘকাল পরে, অন্ততঃ অনুতাপের তাড়নাতেও স্ত্রীর অপরাধ সে বুঝিবে এবং বুঝিয়াই, হয়তো সুবিচারই করিবে।

সৈকত কাঁদিয়াছে যতটুকু মনে-মনে হাসিয়াছে তাহার চতুর্গুণ। স্বামী হইয়া স্ত্রীর ভরণ-পোষণ চালাইবার যোগ্যতা ছিল না যখন—তখনও স্বামী—স্বামীত্ব ফলাইয়াছে, আবার সেই স্ত্রীকে অসংখ্য বিপদের জালে জড়াইয়া দিয়া, একান্ত অসহায় ভাবে ফেলিয়া রাখিয়া শৈল-বৈষ্ণবীর ন্যায় নীচ বেশ্যার রূপের মোহে মজিতেও তাহার এতটুকু বাধে নাই।

দেবতার মত ভক্তি, রাজার অধিক শ্রদ্ধা-সম্মান দেখাইয়া একদিন যে ছোটবাবুর মত নরপশুকে ধাপে-ধাপে আপনার অন্তঃপুরের মন্দিরে আসিবার অনুমতিপত্র দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া দেখে নাই,—আজ সেই লোক অম্লানবদনে সৈকতকে

'গণিকা'—'ব্যভিচারিণী' বলিয়া রূঢ় ভৎর্সনা করে—অপমানের কথায় জর্জরিত করিয়া দেয়।

হ্যাঁ—ছোটবাবুকে সৈকতের সহিত পরিচিত করিবার মূলে তো ব্রজেশ্বরই ছিল। কেন সে শৈলকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল?—আসিলই যদি, কেন স্ত্রীর ভরণ-পোষণের কথা ভাবিয়া দেখিল না? রূপ-পিপাসায় অতিষ্ঠ ব্রজেশ্বর আপন অবিমৃষ্যকারিতার জন্ত আপনি ধ্বংস হইয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে অভাগী সৈকতকেও ধ্বংসের শেষ-চত্বরে নামাইয়া দিয়াছে।··· · আজ সৈকত 'গণিকা—দেহ বিক্রির অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করে—সংসারের চোখে—সমাজের চোখে, হয়তো দুনিয়া-শুদ্ধ নরনারীর চোখেও অবজ্ঞার পাত্রী!

কিন্তু অভিমান-বেদনায় মন ভরিয়া উঠিলেও আজ বন্দী স্বামীর ম্লান মুখ মনে করিয়া সৈকতের দুটি চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। রোদনের ভারে কণ্ঠনালী ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

বন্দী ব্রজেশ্বর বন্দীত্ব স্বীকার করিয়াছে—সৈকতেরই জন্ত! সে-কথা সৈকত অপেক্ষা বেশী করিয়া আর ক'জন জানে? বিনাদোষে কারাবরণ করিয়া এই যে জেলের মধ্যে হীন জীবন-যাপন, ইহা আজ স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া সৈকতের মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। একদিন—দুইদিন নয়, দীর্ঘ তিনবৎসর কাল এই ভীষণ যাতনা ব্রজেশ্বরকে—তাহার স্বামীকে সহ্য করিতে হইবে!···

সৈকতের গাড়ী তাহার সুরম্য অট্টালিকার ফটকে আসিয়া থামিতেই শশব্যস্তে ভৃত্য গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল, বন্দুক হাতে করিয়া সৈনিকের কায়দায় দাঁড়াইয়া কুর্নিস্ করিল শিখ্ দারোয়ান।

মুক্তি-স্নান

সৈকতের পা দুইটা কাঁপিয়া উঠিল!—তাহার মনের মধ্যে বর্শার ফলা দিয়া বিঁধিয়া-বিঁধিয়া কে-যেন জানাইয়া দিল,—ব্যভিচারের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া লক্ষ-লক্ষ টাকা তোর করতলগত, তাই তোর আস্তাবলে গাড়ী, ফটকে দারোয়ান,—বাড়িতে প্রয়োজনের অধিক দাসী-চাকর!—অথচ তোর স্বামী আজ কয়েদ গ্রহণ করিয়া দিনে-দিনে মৃত্যুর সমীপবর্ত্তী হইতে চলিয়াছে!

সেইদিন হইতে সৈকত ভোগ-বিলাস পরিহার করিয়াছে। দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা তার দিবানিশি পাতাই থাকে, স্পর্শ আর করে না। সমস্ত দিনমান সে নির্জ্জলা উপবাস করে, রাত্রে স্বামীর চরণ-চিন্তা করিয়া মনে-মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়—হে ঈশ্বর! আমারই জন্য তাঁর আজ হীন কয়েদীর অবস্থা।—আমাকেই শাস্তি দাও,—তাঁকে শুধু দিয়ো অনাবিল শান্তি!

প্রতিদিন এইভাবে কাটে, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সৈকত স্বহস্তে শাকান্ন গ্রহণ করে—সামান্য একখানি মাদুর. পাতিয়া তাহাতেই রাত্রি যাপন করে—আর সমস্ত রাত্রি একরকম বিনিদ্র থাকিয়াই মনে-মনে চিন্তা করে—কি করিয়া স্বামীর মন পাওয়া যায়, কি-ভাবে তাঁহারই নামে, যা-কিছু তাহার উৎসর্গ করিয়া সন্ন্যাসিনীর বেশে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে।…

মুক্তি-স্নান

অনেকদিন পরে হঠাৎ বিনাসংবাদে একদিন জমিদার হরিপ্রসন্নবাবু আসিলেন।

সৈকত তখন সবে সামান্য আহার্য্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া ছাদে বিশ্রাম করিতেছিল।

ফটকে কেহ বাধা দিতে সাহস করে নাই। হরিপ্রসন্নবাবু ভিতরে অনায়াসেই আসিতে পারিয়াছিলেন।

"বকুল!"

সৈকতের কানদু'টায় কে-যেন একরাশ গলিত সীসা ঢালিয়া দিয়াছে! —'বকুল' কথাটাই আজকাল সে বরদাস্ত করিতে পারে না যেন।

সৈকত হরিপ্রসন্নবাবুকে দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখানে এসেছেন·· কেন?"

"তোমার কাছে মাপ চাইতে এলাম বকু!···সত্যিই আমার অপরাধ হয়েছিল। কিন্তু এবার থেকে সাবধান হয়েছি—আর কখনো এমন কাজ হবে না।"

সৈকত সহসা দুটি হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি অনেক সহ্য ক'রে এসেছি। আমার উপায় ছিল না এতদিন। সহ্য করতেই হ'ত।···কিন্তু আর পারবো না—উপায় আমার থাক্ আর না থাক্—সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে—আর আমি পারবো না।··· আপনি যান—এক্ষুণি যান।"

হরিপ্রসন্নবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কিন্তু তুমি কাঁদছো কেন বকুল?···আমিই তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম। আমার স্ত্রী জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলে—"

তাঁকে আমার কোটী-কোটী প্রণাম দেবেন। সাধ্বীর আশীর্ব্বাদ পেলে হয়তো মনে সান্ত্বনা পাবো। ইহকাল তো তুষের আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছি—পরকালের নাম করতেও বুকে ভয় আসে, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। আমার সর্ব্বনাশ আমিই করেছি! স্মৃতি ধ্বংস হোক্—আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন আজ।"

"কিন্তু সত্যি কথা বকু—"

সৈকত মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আমার নাম 'সৈকত'। বকুলের মৃত্যু হ'য়েছে। কিন্তু আশা করি, আপনারা অনর্থক আমাকে আর যখন-তখন বিরক্ত করতে আসবেন না।"

বলিয়াই ভৃত্যকে ডাকিয়া আদেশ করিল, "বাবুজীকে নীচে—গাড়ীতে চাপিয়ে দিয়ে আয়।"

সৈকত আজকাল প্রতিদিন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে যায়।

ফিরিবার পথে অন্ধ-খঞ্জ, পথ-ভিখারী যত দেখে সকলকে পয়সা দেয়, কখনো-কখনো বাড়ীতে আনিয়া পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করায়। তবু তাহার শান্তি আসে না। মনের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার যে দুর্নিবার বাসনা দিবানিশি তাহার মনকে পীড়া দেয়, সেই বাসনা—স্বামীর তুষ্টি,—কিসে হইবে, কেমন করিয়া করিতে হইবে, ভাবিয়া কোনো কূল-কিনারা পায় না।

মুক্তি-স্নান

সেদিন গঙ্গার ঘাট হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল —রঘুনাথের সহিত।

রঘুনাথ প্রথমে কথা বলিতে সাহস করে নাই। সৈকতই তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আজ ক'দিন থেকে আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম রঘুদা'—ও-বেলায় একবারটি আমার বাড়ীতে আসবে ?"

রঘুনাথ বলিল, "অনেকদিন গিয়ে ফিরে এসেছি। তোমার দারোয়ান ঢুকতে দেয় না।"

ম্লান হাসি হাসিয়া সৈকত বলিল, "আমার নিষেধ আছে রঘুদা'। দারোয়ানের দোষ নেই। কিন্তু তুমি কেন এখনই চলো না? বিশেষ কাজ আছে কি তোমার? আমার সঙ্গে গেলে কোন ক্ষতি হবে না তো?"

রঘুনাথ বলিল, "নাঃ—কাজ আমার কিছু নাই। হরিপ্রসন্নবাবুর চাকরি আর করি না আমি। ব্রজর জেল হওয়ার পর থেকে সে-কাজে আমি ইস্তফা দিয়ে এসেছি।"

"তবে এসো আমার সঙ্গে। কিন্তু কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন তোমার চলছে কেমন ক'রে রঘু-দা'? আর কোথাও কিছু করছো তো?"

"না। এখনো কিছু জোটে নি।"

আর কথা হইল না। সৈকত রঘুনাথের পিছনে-পিছনে আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। রঘুনাথকেও উঠিতে বলিল।

কথায় কথায় বেলা হইয়া গেল অনেকখানি

রঘুনাথ উঠি-উঠি করিতেছিল, সৈকত বলিল, "এত বেলায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হবে, বরং এখানেই খেয়ে যাও রঘুদা'।"

রঘুনাথ হাসিয়া বলিল, "যত বেলাতেই যাই, অদৃষ্টে আছে দু' পয়সার ভাত আর দু' পয়সার ডাল তরকারী। সে যখন খুসী গেলেই পাতের কাছে ধ'রে দেবে।"

"তা হোক! তুমি এখানেই খেয়ে যাও। আমি আমার বামুন ঠাকুরকে ব'লে দিচ্ছি।···কিন্তু দেশ থেকে ফিরে আসতে তোমার ক'দিন হবে?"

"তা ··ক'দিন—বড় জোর তিন দিন।"

"কিন্তু যা-যা ব'ললাম—আমার স্বামীর ভিটে যদি কেউ অধিকার ক'রে থাকে, তা হ'লে তাকে ভদ্রভাবে অনুরোধ করবে,—না শোনে টাকা দিতে চাইবে। মোটকথা আমি সেখানে যেতে চাই রঘুদা'। ক'লকাতায় আর আমি থাকবো না।"

রঘুনাথ বলিল, "সেখানে গিয়েও কি তুমি টিকতে পারবে? নানা জনে নানা কথা কইবে,—টাকা যতই থাক সৈকত, পাড়াগাঁয়ের লোককে তুমি কিছুতে পেরে উঠ্‌বে না। ওরা সব যে-হাতে তোমার কাছ থেকে সাহায্য নেবে, সেই হাত দিয়েই তোমার মাথা লক্ষ্য ক'রে লাঠি ধ'রবে। হয়তো কোন্ দিন রাত-দুপুরে, একা অসহায় স্ত্রীলোক পেয়ে তোমাকে খুন ক'রে যথাসর্ব্বস্ব ডাকাতি ক'রে লুটে নিয়ে পালাবে।"

সৈকত হাসিল।

সে-হাসি ম্লান নয়—উজ্জ্বল।

কহিল, "বৃথাই তোমার আশঙ্কা রঘুদা'। আমি এ-পথে এসে বেশ



বুঝতে পেরেছি দুনিয়া টাকার বশ। টাকা আমাদের যতদিন ছিল না, ততদিন যে-যা ইচ্ছে ব'লেছে, কিন্তু আর কেউ-কিছু ব'লবে না। আমি অর্থ আর মিষ্টি কথা দিয়ে মায়ের মত—বোনের মত গ্রামবাসীদের বশীভূত করবো। কিন্তু তুমি যেন একটিবারও ভুলে যেয়ো না রঘুদা, স্বামীর ভিটেয় আমি বাড়ী-ঘর তৈরী করবো—এ আমার সবচেয়ে বড় সংকল্প।"

রঘুনাথ আহারাদির পর বিদায় লইয়া গেলে সৈকত খোলা ছাদে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল, তারপর স্বহস্তে রন্ধনাদি সমাপন করিয়া ঘরের মেঝেয় শুইয়া-শুইয়া ভাবিতে লাগিল—ব্রজেশ্বর হয়তো এখনও জেলে পরিশ্রম করিতেছে, তাহার মাথার ঘাম ঝরিয়া পড়িয়া পা দুইটি ভিজাইয়া দিতেছে, চোখে আসিয়াছে শ্রাবণের ধারার মত অশ্রুর প্লাবন। হয়তো জেলের পাহারাওয়ালা যথারীতি মেহনৎ করিতে না পারার জন্য তাহার সেই কোমল শরীরে বেত্রাঘাত···

সৈকত দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

উপায় নাই—উপায় নাই!—ভগবান!—হতভাগিনীকে সকলরকমে নিরুপায় করিয়াছ—মনের শান্তিও তাহার হরণ করিলে আজ!

সন্ধ্যার সময় একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে পুনরায় রঘুনাথের আগমন হইল।

সৈকত বিস্মিত হইয়া কহিল, "আবার কি জন্যে এলে রঘুদা? এখনো যাও নি! আমি ভাবছিলাম, এতক্ষণ তুমি রেল-গাড়ীতে!"

রঘুনাথ বলিল, "একটা সুসংবাদ দিতে এলাম সৈকত!"

সৈকত হাসিল।

কহিল, "এখনো তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিতে চাও? আর কত

সুসংবাদ কান পেতে শুনবো রঘুদা’? স্বামী আমারই কৃতকর্ম্মের দোষে জেলে কষ্ট পাচ্ছেন,—দেশময় নিন্দা-অখ্যাতির সীমা-পরিসীমা নেই—এরচেয়ে মেয়েমানুষের মন্দ ভাগ্য আর কি হয়?”

রঘুনাথ বলিল, “আমাদের ছোটবাবু একটিবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।”

সৈকত প্রশান্ত হাসি হাসিয়া বলিল, “ছোটবাবুকে আমার নমস্কার জানিয়ে ব’লো রঘুদা’,—যে, সৈকত তাঁর করুণার পাত্রী, আর যেন নির্য্যাতনের বাসনা তিনি মনে না আনেন।”

“কিন্তু সে-বিষ আর নেই সৈকত। এখন সর্ব্বস্ব খুইয়ে পথে দাঁড়াতে বাকী। তা-ও বোধ হয় দাঁড়াতে হবে। বেশী দেরী আর নেই। উনি ব’লছিলেন কি জানো?”

“কিছু আমি জানতে চাইনে। তাঁর মুখ আছে, তিনি বড়লোক—দু’শো কথা—দু’লক্ষ কথা ব’লতে পারেন—কিন্তু আমি অত্যন্ত দরিদ্র—স্ত্রীলোক, আমার অত কথা শুন্‌বার মত ধৈর্য্য নেই—সময়ও নেই।”

এমনি সময় হঠাৎ পাশের ঘর হইতে ছোটবাবু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “ধৈর্য্য তোমার আছে সৈকত। শুনতে তোমাকে হবে।”

সৈকত চোখে-মুখে আঁচল চাপা দিয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে বলিল, “আমি জানি, এ-দেশের মেয়েরা সকল বিষয়ে দুর্ব্বল। তাই জেনে শুনে আপনারা আজ আমাকে অযথা অপমান করতে এসেছেন। আমারই বাড়ীতে আজ আমাকে কুকথা ক’য়ে হাততালি দিয়ে হাসতে এসেছেন। কিন্তু আর তো আমার সেদিন নেই ছোটবাবু,

আর তো আমি হাসি না—হাসির সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধ শেষ হ'য়ে গেছে।…দয়া ক'রে আপনারা এখন আসুন। ‥রঘুদা', তোমার পায়ে ধরছি,—দোষ-ত্রুটি আমারই হয়েছে ষোলোআনা। তোমাকে আর কষ্ট ক'রে দেশ পর্য্যন্ত যেতে হবে না।—না বুঝে আমিই ভুল করেছিলাম। সেজন্যে আজ ক্ষমা করো।"

ছোটবাবু কহিলেন, "আমি তোমার কাছে মাপ চাইতে এসেছিলাম সৈকত, সেই সঙ্গে আরো কিছু আমার বক্তব্য ছিল। রঘুনাথের মুখে শুনলাম, দেশে তুমি ঘর-বাড়ী করবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে টাকা-পয়সা তোমার অজস্র—"

সৈকত তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "টাকা আমার অজস্র নাই হোক, সামান্য কিছু হয়েছে, এবং তাই দিয়ে আমি আমার স্বামীর ভিটের সুনাম রক্ষা করতে চাই। কিন্তু এ-টাকা ভগবানের আশীর্ব্বাদে নয়, তাঁর অভিশাপে। সামনা-সামনি যে-যাই বলুক, পরোক্ষে আমার কথা আপনারা যা বলেন, সে আমি ভালোরকম জানি।…কিন্তু কি আপনার বক্তব্য, সেইটুকুই খুলে বলুন। বাজে কথা আমি একটাও শুনবো না।"

ছোটবাবু বলিলেন, "নানা কারণে আমার সাংসারিক অবস্থা মন্দ হয়ে গেছে। সম্পত্তিও একে-একে বিক্রি হ'য়ে গেল। যা-কিছু এখনো আছে, বিক্রি না করলে চলে না। যা রাখ্‌তে পারবো না—তা আঁকড়ে ধ'রে থাকা বোকামী।"

"কিন্তু এ-কথা শুনে আমার তো কোনো লাভ নেই।"

লাভ আছে সৈকত। আমার যা কিছু সম্পত্তি এখনো আছে, সবই বেচ্‌তে চাই—আর সে অন্য কোথাও নয় তোমাকে। দেশের লোকের

শক্তি নেই খরিদ করতে। হয়তো ক'লকাতায় চেষ্টা করলে উপায় হ'তে পারতো। কিন্তু একদিন আমি তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছিলাম—"

সৈকত হাসিয়া বলিল, "আজ তাই বকশিস্ দিয়ে আমাকে সন্তুষ্ট করতে এসেছেন? চাকরকে মেরে তার মাথা-ফাটিয়ে দিয়ে বড়লোকেরা বকশিস্ দিয়ে থাকেন শুনেছি। আপনিও কি—"

"জোড়হাত করি সৈকত, ও-কথা নয়। সত্যিই আমি বিপন্ন। টাকা চাই, অথচ সম্পত্তি কিন্‌বার মত খরিদদাব পাচ্ছি না, তাই তোমার কাছে এসেছিলাম—অনুগ্রহ চাইতে।"

সৈকত বলিল, "তিনদিন আমাকে সময় দিন। তিনদিন পরে রঘুদা'র মার্ফতে সব কথা জান্‌তে পারবেন।"

ছোটবাবু অগত্যা এই সর্ত্তেই রাজী হইয়া যাবার সময় বলিয়া গেলেন, "আমাকে দয়া করো—এ-কথা বল্‌বার মুখ আমার নেই সৈকত। তবু জানিয়ে গেলাম—যদি পারো,—বহুদিনের বনিয়াদি জমিদার-বংশের সুনাম রক্ষা ক'রো,—তোমাকে সম্পত্তি বিক্রি করলে,—আমার তাতে ক্ষোভ নেই—বরং আনন্দ বাড়বে।"

সৈকত স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ছোটবাবুর সম্পত্তি খরিদ করিল।

দেশে ব্রজেশ্বরের নাম বজায় রাখিবার জন্য সে যে কি করিবে, ভাবিয়া

ঠিক করিতে পারে না। রঘুনাথ ইতিপূর্ব্বে তিনবার দেশে গিয়া সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া আসিয়াছে।

মন্দির—প্রকাণ্ড মন্দির। অতিথিশালা—ভোজনাগার, আতুরাশ্রম, চিকিৎসালয়…

সৈকতের পরিকল্পনাব আর অন্ত নাই। যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে এ-কাজ করিতেই হইবে। করা তাহার চাই-ই।

২১

বহুদিন পরে ··

একদিন প্রভাতে ব্রজেশ্বর জেলখানার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

দীর্ঘকাল পরে সে আজ মুক্তিলাভ করিয়াছে, বাহিরের উন্মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জেলখানার মধ্যে যে-পাখীটাকে কদাচিৎ গান গাহিতে দেখা যাইত, তাহাকে একদল পাখীর মধ্যে সে দেখিতে পাইল। প্রতিদিন তাহাকে দেখিয়া ব্রজেশ্বর চিনিয়া রাখিয়াছিল—বাহিরেও তাহাকে চিনিতে ভুল হইল না।

তিন বৎসর—বড় কম দিন নয়।

বাহিরে অনেক লোকের সঙ্গে সে মিশিইয়া গেল, সে তাহাদেরই মধ্যে একজন ছিল, আজ আবার তাহাদেরই একজন হইয়াছে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে সারাদিন সে ঘুরিয়া বেড়াইল। জেলখানা তবু ভালো ছিল, দুই বেলা খাইতে পাওয়া যাইত, বাহির হইয়া সারাদিনের মধ্যে কেবল মাত্র জল ছাড়া সে আর কিছুই খাইতে পাইল না।

মুক্তি-স্নান

সন্ধ্যার দিকে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া সে কুলির কাজ করিতে গেল ·· যা দুই-চার পয়সা পাওয়া যায়, সে কিছু খাইতে পাইবে।

উপায়টা মন্দ নয়, একদিনেই কয়েক-আনা লাভ হইল। ব্রজেশ্বর কাছাকাছি একটা হোটেলে গিয়া পেট ভরিয়া খাইল, রাত্রে ফুটপাতের একপাশে পড়িয়া ঘুমাইল।

আবার সকাল হইতে সে ঘুরিতে লাগিল।

ভালো হোক্ আর মন্দ হোক্—মানুষের দিন ইহাতেও চলে। দেশের লোকেরা হাহাকার করে, কেহ কেহ আত্মহত্যাও করে, কুলির কাজও যদি তাহারা করিত, আর কিছু নাই হোক্ অন্ততঃ পেট ভরিয়া খাইতে পাইত।

হঠাৎ সেদিন পথে দেখা হইল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে।

"একি ব্রজ যে? আছ কেমন—ভালো তো?

ব্রজেশ্বর উত্তর দিল, "ভালো বই কি। তারপর···তোমাদের খবর কি?"

সিদ্ধেশ্বর বলিল, "আমাদের এই একরকম ক'রে কেটে যাচ্ছে মন্দ নয়। বাবা আজ বছর-খানেক হল মারা গেছেন, আমিই এখন সংসারের কর্ত্তা। যাক, জেল হতে বার হয়েছ কবে, কি কাজ করছো?"

সে যে জেলে গিয়াছিল সে-খবরও গ্রামে গিয়া পৌঁছিয়াছে! একদিন ছিল, যেদিন এ-কথায় ব্রজেশ্বর অপমান জ্ঞান করিত, আজ সে গায়েই মাখিল না; বলিল, "মাসখানেক হল বার হয়েছি। আপাততঃ কুলির কাজ করছি। একে-একে সব কাজই করেছি, ভাবলুম এটাই বা বাকি থাকে কেন, উদর-পূরণের জন্যে একটা কিছু কাজ করতেই তো হবে।

বিয়ে যখন নেই, তখন এই কুলির কাজ ছাড়া আর উপায় কি ? চলছেও মন্দ নয়।"

সিদ্ধেশ্বর আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল, "সে কি, তুমি কুলির কাজ করছো! এ-দিকে তোমার স্ত্রীর ··সে তার লাখ-লাখ টাকা-দান করে গেল, দেশে তোমার ভিটেয় মন্দির অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করলে,—অথচ তোমার জন্যে কিছু দিলে না! যদি দশটা হাজার টাকাও তোমায় দিত—তোমার দিন যে রাজার হালে কাটত ব্রজ। সে কোথায় না টাকা দিয়েছে ? চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে—এমন লোক আর হবে না। কত দীন-দরিদ্র দেশ-বিদেশে তার সাহায্য পেলে, আর তুমি—তুমি যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই রয়ে গেলে ?"

ব্রজেশ্বর বলিল, "আমার অদৃষ্ট, কিন্তু সে-কথা যাক, সে আমার ভিটেয় কি করেছে বললে ?"

সিদ্ধেশ্বর বলিল, "তুমি বরং একদিন গিয়ে দেখে এসো না, গ্রাম তো তিনদিনের পথ নয়।"

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "সে-ও সেখানেই আছে তো ?"

সিদ্ধেশ্বর বলিল, "না, শুনেছি এই সব খরচ চালানোর জন্যে হাজার কতক টাকা কয়েকজন লোককে ট্রাষ্টি করে তাদের হাতে দিয়ে, সে কোথায় বৃন্দাবন না মথুরায় চলে গেছে।"

"ও" বলিয়া ব্রজেশ্বর অন্যদিকে ফিরিল।

সিদ্ধেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "একদিন দেশে যাচ্ছো তো ?"

চলিতে চলিতে ব্রজেশ্বর বলিল, "দেখি—"

মাথার মধ্যে অহরহ সেই কথাটাই জাগিতেছিল সৈকত নিজের

কথা রক্ষা করিয়াছে, সে তাহার বিশাল সম্পত্তি দশের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়া নিজে ভিখারিণীর বেশে কোথায় চলিয়া গিয়াছে !

একদিন তাহারই কীর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্রজেশ্বর বাড়ী যাইবার জন্য ট্রেণে উঠিয়া বসিল।

তিন-চার বৎসর পরে একদিনের জন্য গ্রামে ফিরিয়া ব্রজেশ্বর দেখিয়াছিল—তাহার ভিটা ভট্টাচার্য্যের জমির মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে, তাহার হাতের স্থলপদ্ম-ফুলের গাছটাই অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

আজ সাত বৎসর পরে সে আবার গ্রামের বুকে ফিরিল। বহুদূর হইতে মন্দিরের উচ্চ চূড়া তাহার চোখে পড়িল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে মাত্র, মন্দিরে আরতির উদ্যোগ চলিতেছিল।

ব্রজেশ্বর মন্দিরে উঠিতে পারিল না, বাঁধানো চত্বরে দাঁড়াইয়া গোধূলির লাল আলোয় সে দেখিতে পাইল—মন্দিরের উপরে সোনার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

'পতি দেবতার স্মৃতিতে দেবতা প্রতিষ্ঠা'

কিন্তু এ কি, চোখে জল আসিয়া পড়ে কেন, এ কি দুর্ব্বলতা ?

ব্রজেশ্বর তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল।

পাশ দিয়া কে একজন চলিয়া যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মশাই কি অতিথি ?"

মুক্তি-স্নান

ব্রজেশ্বর বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইল, মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, বেড়াতে এসেছি।"

লোকটা বলিল, "উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, মন্দিরে গিয়ে দেখুন সব। আমাদের এ-মন্দিরে সবাই ঢুকবার অধিকার পেয়েছে মশাই, শিব-পূজো নিজের হাতে করবার অধিকার সবারই আছে। আপনি এখান হতে দাঁড়িয়ে বিশেষ কিছুই দেখতে পাবেন না।"

ব্রজেশ্বর বলিল, "সব দেখব মশাই,—আমি এখনো দু' ঘণ্টা এখানে আছি, এর মধ্যে সবই দেখে নেবো এখন।"

আরতি আরম্ভ হইল। দেখা গেল, গ্রামের সকলেই এখানে আসিয়া জুটিয়াছে।

আরতির পরে নাম-কীর্ত্তন, তাহার পরে প্রসাদ বিতরণ। অবশেষে সকলেই সেই দয়াবতী নারীকে অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া, তাহার দীর্ঘ জীবন ও শান্তি কামনা করিয়া আপন-আপন ঘরে ফিরিয়া গেল।

ব্রজেশ্বর আড়ষ্ট ভাবে একপাশে দাঁড়াইয়া সবই দেখিল।

না,—কে বলে তুমি আজও পতিতা সৈকত, তোমার দান—তোমার ত্যাগ তোমায় মহান্ করিয়াছে, তোমায় দেবীর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

মানুষ পাপ করে, কিন্তু সে-পাপ তো ধুইয়া মুছিয়াও ফেলা যায়।

সৈকত পাপ করিয়াছিল, সে-পাপ সে চোখের জলে ধুইয়া ফেলিয়াছে, কঠোর প্রায়শ্চিত্তও সে করিয়াছে।

আজ ব্রজেশ্বরের মনে হইতেছে, যদি একবার তাহার সহিত দেখা হইত ..

ব্রজেশ্বরই তাহার কাছে ক্ষমা চাহিত, পতিতা সৈকত নিজের কাজে অনেক উপরে উঠিয়া গিয়'ছে, আব ব্রজেশ্বর? সে যেখানে ছিল সেখানেই রহিয়া গেল।

আজ এখানে তাহাকে কেহই চিনিতে পারিল না, চিনিতে পারিবে না বলিয়াই সে সন্ধ্যাবেলায় আসিয়াছে, পরিচিত লোকদের এড়াইয়া গিয়াছে।

অপরিচিত মন্দিরবাসী একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিতে পারিল সৈকত বৃন্দাবনে গিয়াছে, নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়া সেখানে সে ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করে।

সকলের অজ্ঞাতেই ব্রজেশ্বর যখন মন্দির ত্যাগ করিয়া আবার ষ্টেশনের পথ ধরিল, তখন অন্ধকার চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে।

আকাশের গায়ে অসংখ্য তারা তখন ঝিকমিক করিয়া জ্বলিতেছে, বাতাস গাছেব পাতা কাঁপাইয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

দূরে কোথায় বাঁশী বাজিতেছে,—কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাহাকে ফিরিয়া চাহিতেছে।

ব্রজেশ্বরের মনের মধ্যেও ঠিক এই সুরটী বাজিতেছিল—

এসো হে ফিরে এসো—
বঁধু হে ফিরে এসো।

২২

কুটীরের দরজা খুলিয়া বাহিরে হইতেই সৈকত সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইল—সে ব্রজেশ্বর ছাড়া আর কেহ নয়।

নিঝুম ভাবে সে পড়িয়া ছিল—মুখখানা অন্যদিকে ফিরানো থাকিলেও, তাহাকে চিনিতে সৈকতের এতটুকু বিলম্ব হইল না।

মুহূর্ত্তমাত্র সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একদিন যে দারুণ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, সৈকতের মুখের পানে ফিরিয়া চাহে নাই, সেই আজ সৈকতের কুটীরের সামনে আসিয়াছে—এ যেন একেবারে অবিশ্বাস্য!

ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ব্রজেশ্বরের মাথার কাছে দাঁড়াইল।

ব্রজেশ্বর নড়িল না, চাহিল না।

সৈকত ডাকিল—"শুনছো,—এখানে অমন করে পড়ে রয়েছ কেন? ওঠো।"

ব্রজেশ্বর একবার চক্ষু মেলিল, তাহার চক্ষু লাল—মুখখানাও কি-রকম দেখাইতেছিল।

সৈকত নীচু হইয়া তাহার ললাটে হাত দিল। আগুনের মত গরম!

কখন সে আসিয়াছে, কত রাত্রি হইতে পড়িয়া আছে কে জানে! হয়তো

সমস্ত রাত্রিই সে এখানে এই রকম ভাবে পড়িয়া আছে, প্রবল জ্বরে, তৃষ্ণায় তাহার বুক ফাটিয়া গেছে, সে সৈকতকে ডাকে নাই।

নারী-হৃদয় করুণায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

সৈকত ব্রজেশ্বরের পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল, তাহার গায়ের উপর একখানা হাত রাখিয়া ডাকিল, "এখানে এমন করে পড়ে র'য়েছ কেন? ঘরে চল, বিছানা পেতে দিই—শুয়ে থাকবে।"

এবার যেন ব্রজেশ্বরের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে বিস্ফারিত নেত্রে সৈকতের পানে তাকাইল।

"সৈকত!"

সৈকত মাথা নাড়িল, "না, সৈকত মরে গেছে, আমি মাতাজি—"

ব্রজেশ্বর ক্লিষ্টকণ্ঠে বলিল, "আমার কাছে চিরদিনই তুমি সৈকত, তুমি বকুল নও, মাতাজি নও, আমি তোমায় সৈকত বলেই জানি।...হ্যাঁ, আমি কাল রাত্রে এসেছি, অনেক খোঁজ করে তোমার কুটির পেয়েছি কিন্তু সাহস করে তোমায় ডাকতে পারি নি। জানি তুমি যখন উঠবে, দরজা খুলে আমায় দেখতে পাবেই।"

সৈকত জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কি করতে তুমি এখানে এসেছ? এবার তো আমি তোমায় অনুসরণ করি নি। তুমি কেন এসেছ?"

ব্রজেশ্বর কাতরভাবে বলিল, "একদিন তুমি যখন ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলে, আমি তোমায় নিদারুণ অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, আজ সেই জন্যেই তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি সৈকত, আমায় ক্ষমা কর—আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাই।"

সৈকতের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, "ক্ষমা

তোমায় কেন করব, দোষই তো তোমার আমি পাই নি! তুমি যা করেছিলে, প্রতি স্বামীই তা করে থাকে, কোন স্বামীই এ-পর্য্যন্ত স্ত্রীর ব্যভিচার সহ্য করতে পারে নি। কিন্তু না, এখানে এমন করে পড়ে থাকা তোমার চলবে না। ওঠো, আমি তোমায় ঘরে নিয়ে যাই।"

দুই-একবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াও ব্রজেশ্বর উঠিতে পারিল না, শ্রান্তভাবে মাটির উপর মাথা পাতিয়া বলিল, "এখন এখানেই থাকি সৈকত, জ্বর একটু কমলেই আমি চলে যাব।"

সৈকত বলিল, "সে হবে না, আমি তোমায় ধরছি, আমার পরে ভর দিয়ে তুমি ঘরে এসো। এখানে এই মাটির পরে আমি তোমায় পড়ে থাকতে দেব না।"

সে জোর করিয়া ব্রজেশ্বরকে টানিয়া তুলিল। তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কুটিরের মধ্যে শোয়াইয়া দিল।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "এখানে আসতে ট্রেনেই জ্বর এসেছে সৈকত, আগে যদি জানতুম, তাহলে এখানে আসতুম না।"

একটু হাসিয়া সৈকত বলিল, "আমি তাই বলে তোমায় তাড়িয়ে দেব না। আমি জীবসেবা-ব্রত নিয়েছি, তুমিও তো সেই নর-নারায়ণের একজন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—আমার মনের গতি যেন আর না বদলায়, আমি যে-ব্রত নিয়েছি, সে-ব্রত যেন সমাপ্ত করতে পারি। তুমিও আশীর্ব্বাদ কর দেবতা,—আমার ব্রত যেন ব্যর্থ না হয়, আমি যেন আমার বাকি জীবনটা এই রকমই নির্লিপ্ত ভাবে কাটিয়ে দিতে পারি।"

ব্রজেশ্বর তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, সে-মুখে যে দীপ্তি সে ফুটিয়া উঠিতে দেখিল, তাহা বাস্তবিকই স্বর্গীয়।

সে উত্তর দিল, "আমি আশীর্ব্বাদ করবার উপযুক্ত পাত্র নই, তবু যদি
ায় যোগ্য বলেই জেনে থাক, আমি আশীর্ব্বাদ করছি সৈকত, তোমার
সার্থক হবে—।"

সুস্থ হইয়া উঠিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, "এবার আমায় যেতে হবে সৈকত,
ার এখানে থাকা আর তো আমার চল্‌বে না।"

সৈকত শান্তকণ্ঠে বলিল, "কেন চলবে না? তুমিও স্বামীজির কাছ
ীক্ষা নাও। বৃন্দাবন তো আমাদেরই মত লোকের জন্যে।…যে
র সুর তোমায় ডেকে এনেছে, সেই বাঁশীর সুরই তোমায় চিরকাল
করে রাখবে।"

ব্রজেশ্বর মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তিনি আমায় দীক্ষা দেবেন?
কি বলে আমার পরিচয় দেবে সৈকত?"

উজ্জ্বল নেত্র তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া সৈকত বলিল, "তিনি
জানেন। তিনি জানেন—তুমি আমার স্বামী।"

জেশ্বর তাহার দৃপ্ত মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।
কণ্ঠে ডাকিল—"সৈকত!"

স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় নিয়া সৈকত উত্তর দিল, "দেবতা—'
জেশ্বর বলিল, "আজ সত্যিই তোমায় পেলুম সৈকত। আমাদের
মিলন এইখানেই হোক, দেহের ব্যবধান আমাদের পর করেছে

রাখুক। ভোগের বাসনা যেন কোনদিন আমাদের মনে না জাগে,—আজ থেকে তুমি আমার অন্তরের স্ত্রী। কিন্তু আমায় সত্যিই ক্ষমা করতে পেরেছ সৈকত—?"

সৈকত হাসিল।

"বলেছি তো, তোমার দোষ আমি পাই নি—তাই ক্ষমার কথাও কে দিন আমার মনে জাগে নি। নরকে পড়েছিলুম, আবার তুমিই আমার স্বর্গে টেনে আনলে।"

সৈকত ব্রজেশ্বরের পায়ের উপর মাথা রাখিল

